গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১১ - ১৬ মার্চ ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ খসে পড়ল জনমুখী পলেস্তারা

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর প্রশংসায় সিপিএম সহ শিল্পমহলের উচ্ছ্বাসের রেশ মেলাবার আগেই পলেস্তারা খসে ভেতরের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। বাজেটকে গ্রামমুখী বলে যখন ঢাক পেটানো চলছে এবং বামপন্থীদের প্রভাবের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে ইউপিএ সরকারের সমর্থক বৃহৎ বামেরা কৃতিত্ব দাবি করে জনসাধারণকে প্রতারণা করার চক্রান্তে নেমেছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ভিতর থেকেই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাজেটে গ্রামীণ ক্ষেত্রে বরাদ্দবৃদ্ধির যে হিসাব দেখানো হয়েছে, তা নিছক ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই না। এ সবই অঙ্কের কারসাজি।

ইউপিএ সরকারের এটা দ্বিতীয় বাজেট। কেন্দ্রে সরকার বদলের পর, প্রথম বাজেট পেশ করার সময় তাদের অজুহাত ছিল — এই সরকার সবে এসেছে, সবদিক বিবেচনা করে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট করার সময় পায়নি। এবার দ্বিতীয় বাজেট পেশের ক্ষেত্রে সে অজুহাত অচল।

বাজেটের পটভূমি

টানা পাঁচ বছর বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকারের প্রতারণা এবং একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে কংগ্রেস প্রবর্তিত নয়া আর্থিক নীতি অনুসরণে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেপরোয়া বেসরকারীকরণ, বিদেশি পুঁজির ঢালাও অনুপ্রবেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থে গুরুতর আঘাত করে জনকল্যাণমূলক খাতগুলিতে নির্মম ব্যয় ছাঁটাই, ব্যাপক বেকারি ও অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির চাপে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ বর্তমান শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে এই সরকারের আমলে একটু রেহাই চাইছিল। অন্তত এই সরকারের সমর্থক বৃহৎ বামপন্থীদের বক্তৃতা, বিবৃতি মানুষের মধ্যে খানিকটা হলেও সেই আশা জাগিয়ে তুলেছিল।

কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির দাপটবৃদ্ধি, সার-বীজ-সেচ সহ সমস্ত কৃষি সরঞ্জামের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দামও না পাওয়া, ঋণে জর্জরিত চরম অভাবগ্রস্ত কৃষকদের বাঁচার কোন পথ না পেয়ে মর্মান্তিক আত্মহত্যা, শিল্পক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই, চাকরির অনিশ্চয়তার আতঙ্ক, বাঁচার মতো মজুরির অভাব, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাকেই আজ চরম অভিশাপে পর্যবসিত করেছে। '৯১ সালে নরসিমহা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে নয়া আর্থিক নীতি চালু করার সময় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, পাঁচ বছর বাদে মানুষ এর সুফল পাবে। পাঁচ বছরে কেবল দুর্দশাবৃদ্ধি ছাড়া কিছুই যখন হল না, তখন তিনি বলেন — দশ বছরে সুফল পাওয়া যাবে। আজ পনের বছর বাদে মানুষ দেখছে, এই আর্থিক নীতি অতি মুষ্টিমেয় একদল ধনীকে আরও ধনী করেছে, সাথে সাথে দেশের ব্যাপক অংশের মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মরণখাদের ধারে। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতা এবং তাদের অনুসৃত আর্থিক নীতি, যা মানুষকে দুর্দশার চরম অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে — এই দুয়ের বিরুদ্ধেই এবার মানুষ ভোট দিয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, গরিব চাষীর অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য সরকার সক্রিয় হোক — এই চাহিদা দেশের মানুষের মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

এইদিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ জোট নির্বাচনের সময়, একশো দিন কর্মসংস্থানের আইনগত অধিকার প্রদানের এক লোভনীয় টোপ জনসাধারণের কাছে হাজির করেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তাদের প্রতি বৃহৎ বামেদের সমর্থন। তাই, কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার যে পূর্বতন বিজেপি সরকারের মতো নয়, তারা যে অন্য ধরনের, এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

২০০৫-০৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

কংগ্রেস পরিচালিত এবং সিপিএম-সিপিআই'র সমর্থন নির্ভর ইউপিএ সরকার ২০০৫-০৬ সালের বাজেট পেশ করেছে, যার মধ্য দিয়ে, আশঙ্কা মতোই, জনদরদের নামাবলী জড়িয়ে জনজীবনের জ্বলন্ত আর্থিক সমস্যাগুলি থেকে জনগণের দৃষ্টিকে বিপথে চালিত করার কৌশলী প্রয়াস করা হয়েছে। মনভোলানো কথা, বাগাড়ম্বর ও পরিসংখ্যানের কারসাজির আশ্রয় নিয়ে ক্রমবর্ধমান বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধির মতো মূল সমস্যা যা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। সরকারের যেখানে উচিত ছিল সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া, মূল্যবৃদ্ধির রাশ টেনে ধরার বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সেখানে তা না করে সরকার সবটাই ছেড়ে দিয়েছে বাজারের শক্তি, অর্থাৎ দেশিবিদেশি একচেটিয়া গোষ্ঠী, পুঁজিপতিশ্রেণী ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মর্জির উপর। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকার থেকে ধীরে ধীরে সরকারকে সরিয়ে নেওয়া এবং গোটা অর্থনীতিকে দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে আরও নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন চালাবার জন্য তুলে দেওয়ার সরকারি নীতি এবার বাজেটের নীতিনির্ধারক ঘোষণাগুলির মধ্য দিয়ে আরও যেমন প্রকট হয়েছে, তেমনি বিশ্বায়ন-উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে নানা বাকচাতুর্যের আড়ালে।

সুতরাং এই বাজেট থেকে দেশের জনগণের আশা করার কিছু নেই। আগামী দিনে যে দুর্দশা ও শোষণ জনজীবনে আরও তীব্র হয়ে দেখা দেবে, তাকে মোকাবিলা করতে হলে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নির্ভর করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

জলঙ্গী ঃ ভাঙন দুর্গতদের অনাহারে মৃত্যু, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি জলঙ্গীর দয়ারামপুর এলাকায় ভাঙন-দুর্গত সর্বস্বান্ত আলিমুদ্দিন সেখ অনাহারে মারা গেলেন। তখন তাঁর স্ত্রীও মৃত্যুশয্যায়। এই সংবাদ লেখার সময়ে তাঁরও মৃত্যুসংবাদ দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হল। সরকারি তরফের ধারাবাহিক অবহেলার দরুণই যে এই অনাহারে মৃত্যু, সেই সংবাদ অবশ্য নিয়মমাফিক জেলা-শাসক, ডোমকল এস ডি ও এবং পঞ্চায়েত প্রধান অস্বীকার করেছেন। শুধু এই দু'জনই নয়, এ মাসের গোড়ায় একইভাবে মারা গিয়েছেন জুনেরা বিবি। ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে পরাশপুরে মারা গিয়েছেন গহর মণ্ডল। সংবাদে প্রকাশ, অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাঁচ। একের পর এক ভাঙন দুর্গত নিরাশ্রয়, রুটিরুজিহীন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। প্রশাসন, মন্ত্রী, পঞ্চায়েত সবাই নির্বিকার। কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে, মৃত্যু যে অনাহারে নয় তা প্রমাণ করতেই সকলে ব্যস্ত। তাদের মিথ্যাচার ধরা পড়েছে জলঙ্গীর ব্লক মেডিক্যাল

আটের পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির মিছিল ও ডেপুটেশন

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ৭০৪ কোটি, সি ই এস সি'তে ৬৫.৪৮ কোটি মাশুলবৃদ্ধির পরিকল্পনা, মাশুল বৃদ্ধির কারণ 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিলের দাবিতে

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে

২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযানে যোগ দিন

উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থায় ছাঁটাইয়ের ষড়যন্ত্ররোধে আন্দোলন শুরু

রাজ্যের পাঁচটি পরিবহণ সংস্থায় ই আর এস-এর মাধ্যমে ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ছাঁটাই তালিকা তৈরি করতে ইতিমধ্যেই সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে পরিবহণ সংস্থার পুনরুজ্জীবনের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থ লগ্নিকারী সংস্থাগুলির ঋণশর্ত। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান গ্লোবাল ফিনান্স নিয়ন্ত্রণাধীন সাউথ ইস্ট এশিয়া ব্যাঙ্ক ৫০০ কোটি টাকা ঋণের শর্ত হিসাবে অন্তত দু'হাজার শ্রমিককে বিদায় দিতে বলেছে। বর্তমানে এই নিগমে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছেন। তার প্রায় অর্ধেক ছাঁটাই করার শর্ত দিয়েছে এই সংস্থাটি। রাজ্য সরকার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সি এস টি সি-তে ২৫ শতাংশ কর্মচারীকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এই কমিটি এস বি এস টি সি-তেও ছাঁটাইয়ের পরামর্শ দিয়েছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের কাছারি মোড়ে গণঅবস্থান

পরিবহণ সংস্থায় ঋণ দিতে চাইছে ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি। এদেরও শর্ত শ্রমিক কমাও। আগাম অবসরের টাকা মেটানোর জন্য বাড়তি ঋণও দিতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলি এভাবে ঋণ দিয়ে বলছে, সংস্থার আধুনিকীকরণ করতে হবে, যার অর্থ পরিবহণ সংস্থাকে লাভজনক করতে হবে। এজন্য শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে। এরপরই বলবে, ভাড়া আরও বাড়াতে হবে। তারপর বলবে, নতুন বাস ও যন্ত্রাংশ বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হবে। ঋণের শর্ত এভাবেই কাজ করে। আর এ কাজে সিপিএম সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়কে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি সিপিএমের হাত ধরেই এ রাজ্যে আসছে। এদেরই সুরে সুর মিলিয়ে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে ভিআরএস-এর দাবি তুলেছে।

শ্রমিক-কর্মচারীরা আশঙ্কিত — কখন ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসে এই চিন্তায়। তারা আন্দোলনের পথে সামিল হয়েছে। ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও শ্রমিক-কর্মচারী বাঁচাও কমিটি'। এই কমিটি গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের কাছারি মোড়ে গণঅবস্থান কর্মসূচী পালন করে। (১) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বেসরকারীকরণ বন্ধ, (২) লোকাল ও দূরপাল্লার সমস্ত রুটে সরকারি বাস চালানো, (৩) শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, (৪) সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ স্থাপন, (৫) উল্টোডাঙার এন বি এস টি সি'র বাস টার্মিনাস বিক্রির সঠিক তথ্য প্রকাশ, (৬) পরিবহণের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান, (৭) যাত্রী পরিষেবার উন্নতি প্রভৃতি দাবিতে ছিল এই গণঅবস্থান। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি কুমার ত্রিকুলেন্দ্র নারায়ণ, সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী। এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিপুল ঘোষ, কালুসোনা ঘোষ (ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, নবপর্যায়), পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল (সংগ্রামী রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন), নেপাল মিত্র (নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি), মানিক বর্মন (ডি ওয়াই ও), স্বপন ঈশোর (ডি এস ও)। এই কমিটি উপরোক্ত দাবিতে ২ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমীপে গণডেপুটেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কে কে এম এসের উদ্যোগে পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

ফসলের ন্যায্য দাম, সস্তায় ডিজেল ও বিদ্যুৎ, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, উপযুক্ত মজুরি, পরিচয়পত্র, বিপিএল কার্ড, রেশনকার্ড, জমির অস্বাভাবিক খাজনা প্রত্যাহার ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এবং নয়া পঞ্চায়েতি ট্যাক্স, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্বের আহ্বানে বালী-১ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মানুষের পঞ্চায়েত অফিস অভিমুখী দৃপ্ত মিছিল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঠের কাজকে গৌণ করে চাষী-মজুরদের এহেন কর্মসূচি সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষদের প্রেরণা জোগায়। দলীয় সংকীর্ণতা ভুলে অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মিছিলে অংশ নেন।

মিছিল পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছুলে এ আই কে কে এম এসের আঞ্চলিক সভাপতি কমরেড আবদুল্লাহ মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দেন ও উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এসের নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আস্তাব আলী, মধুসূদন দাস প্রমুখ।

পঞ্চায়েতপ্রধান সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয় অবহিত করবেন বলে জানান। তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি জনসমক্ষে এসে একথাগুলি বলেন এবং সিপিএম দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যদি সরকার এখানে মদের দোকানের লাইসেন্স দেয় তবে তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে তা উচ্ছেদ করবেন।

বাগনানে মদবিরোধী আন্দোলন

হাওড়া জেলার বাগনান থানার কাঁটাপুকুর গ্রামে ব্যাপকহারে চোলাই মদের ব্যবসার বিরুদ্ধে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে ও আবগারি বিভাগে ডেপুটেশন দেওয়া হলেও তারা এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গ্রামে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি শ্রীমন্ত ধাড়া ও এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীকান্ত জানা সহ গ্রামের বহু মানুষ।

জলপাইগুড়ি

নাগরিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কচুয়া বোয়ালমারী নন্দনপুর নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে দশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল মিছিল ১০ দফা দাবি আদায়ের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। আগের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি সারা রাত্রি ধরে সিপিএম মাইক প্রচার করে আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করলেও জনসাধারণকে তারা আটকাতে পারেনি। দীর্ঘদিন থেকেই এইসব সমস্যা নিয়ে দলমত নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত জনসাধারণের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বোয়ালমারীর মধ্য দিয়ে হলদিবাড়ী পর্যন্ত জেলা পরিষদের তৈরি রাস্তার মধ্যে মণ্ডলঘাট থেকে কানাপাড়া এই ৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে মেরামতির অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ষায় প্রতি বছর রাস্তার দু'ধারে মাটি ধ্বসে গিয়ে রাস্তাটি খুবই বিপজ্জনক হয়ে আছে। দু'টি গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না। প্রতিদিন কয়েকটি বাস এই পথে যাতায়াত করে। কয়েক হাজার মানুষ নানান কাজে জলপাইগুড়ি শহর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। এছাড়া এই এলাকার সমস্ত কৃষক তাদের কৃষিজাত পণ্য নিয়ে রিক্সাভ্যানে হলদিবাড়ী যায়। রাস্তার বর্তমান অবস্থায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে এবং তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এলাকার গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্রটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তার বা অন্যান্য স্টাফ কেউই এখানে থাকেন না। প্রায়দিনই হাসপাতাল বন্ধ থাকে। হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলি বসবাসের অযোগ্য। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, টেলিফোন নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। সরকারি অবহেলা এবং বঞ্চনা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

তাই এলাকার সমস্ত জনসাধারণ নাগরিক কমিটি গঠন করে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলা পরিষদ অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। কমিটির সম্পাদক হরিভক্ত সর্দারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সভাধিপতি ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মহেন্দ্র মণ্ডল, পরিমল ঘোষ, সহদেব ব্যাপারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ মল্লিক, সুরেশ রায় এবং আরও অনেকে। অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সভাধিপতি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন। পরে এক বিশাল মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে কদমতলা মোড়ে পথসভা করে। পথসভায় বলা হয়, যদি প্রশাসনিক তরফ থেকে সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা না হয়, তাহলে আগামী দিনে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই আন্দোলনের ফলে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

জেলা পরিষদ অফিসে নাগরিক কমিটির বিক্ষোভ

বালাপাড়া মোড় নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম ক্ষমতায়। কিন্তু এলাকা আজও অনুন্নয়নের অন্ধকারে পড়ে আছে। আজও সেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছোয়নি। অতিরিক্ত আয়রনযুক্ত জল খেয়ে এলাকার মানুষ প্রতিদিন নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সমস্যাদীর্ণ এই মানুষগুলি তাই আজ আন্দোলনের পথে সামিল হয়েছে। আন্দোলনের জন্য গড়ে উঠেছে 'বালাপাড়া মোড় নাগরিক কমিটি'। এই কমিটি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রামপঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দাবি জানিয়েছে। গ্রামের শত শত মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রায় একশত মানুষের সুসজ্জিত মিছিল পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক প্রদীপ বসাক, সদস্য সুবোধ দেবনাথ এবং বিনয় বন্ধু মজুমদার। পঞ্চায়েতপ্রধান প্রতিনিধিদের যুক্তিগুলি মেনে নিয়ে সমস্যার ভয়াবহতা স্বীকার করেন এবং প্রতিকারে যথাসাধ্য ভূমিকা পালনের আশ্বাস দেন।

তারকেশ্বর-চাঁপাডাঙ্গায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের সম্মেলন

হুগলি জেলার আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, দাদপুর, পুরশুড়া থানা সম্মেলনের পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি চাঁপাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে অ্যাবেকা'র তারকেশ্বর-চাঁপাডাঙ্গা থানা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তারকেশ্বর থানা কমিটির সভাপতি তাপস সাহা। চাঁপাডাঙ্গা-তারকেশ্বর থানা কমিটির সম্পাদক সুনীল মাইতি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৯ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন। আরামবাগ মহকুমা কমিটির ইনচার্জ, হুগলি জেলা কমিটির সদস্য প্রবীর ভকত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। সম্মেলনে সুনীল মাইতিকে সম্পাদক করে মোট ২৭ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী যে পথে হাঁটছেন তা মোটেই অচেনা নয়

সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পার্টির ২১তম সম্মেলন মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৯ - ১১ ফেব্রুয়ারি, উত্তর ২৪ পরগণার কামারহাটিতে। কংগ্রেস, বিজেপি'র মত দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলির সম্মেলনে যে ধরনের বিলাস ও আড়ম্বর দেখা যায়, সিপিএমের এই সম্মেলনে তা কোন অংশে কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। বামপন্থী সংস্কৃতি বলতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ যা এযাবতকাল জেনে ও বুঝে এসেছেন, এই সম্মেলনে কোথাও তার ছিটেফোঁটা প্রতিফলনও ছিল না, পদে পদে ছিল বুর্জোয়া সংস্কৃতির দাপট। রাজ্যের সাধারণ মানুষের চোখে এ জিনিস মোটা দাগে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। জন্মের পর থেকেই বামপন্থী স্লোগান, মার্কসবাদী নাম ও লাল ঝাণ্ডার আড়ালে নিজেদের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র নিয়ে এগিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। যথার্থ শ্রেণীচেতনা না থাকার কারণে শুধু সাধারণ মানুষই নন, তাদের কর্মী-সমর্থকরাও তা ধরতে পারেননি। কিন্তু যত দিন গেছে, বিশেষ করে সিপিএম ক্ষমতায় বসার পর তাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র ক্রমেই পরিষ্কার হয়েছে এবং এখন তাদের রাজনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুর্জোয়া খাত ধরে বইছে; সাধারণ মানুষেরও আজ তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। তাদের সরকার পরিচালনার প্রতিটি পদক্ষেপ, রাজ্য সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাব এবং সেগুলির সমর্থনে নেতাদের বক্তব্য ও সম্মেলনের আয়োজনের বিপুল জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নীতি ও সংস্কৃতি। ফলে তাদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বহু প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, আলোড়ন দেখা দিয়েছে। রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদের বক্তব্যেও ছিল সেই আলোড়নেরই সুর। কামারহাটিতে সম্মেলনের শেষে মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জবাবী ভাষণের ছত্রে ছত্রে ছিল সেই আলোড়িত প্রশ্নগুলির জবাব দেবারই কৌশলী চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভাষণ ১২ ফেব্রুয়ারি দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে প্রথম পাতায় বেশ ফলাও করেই ছাপা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বুদ্ধদেববাবু তাঁর ভাষণে কথার মায়াজাল সাজিয়ে সিপিএম সরকারের গৃহীত নীতি ও কার্যকলাপকে 'গোটা দেশে বিকল্প' হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল, বামফ্রন্ট সরকারও উদার আর্থিক নীতিই অনুসরণ করছে; তবে কংগ্রেস-বিজেপি'র মতো বুর্জোয়া দলগুলো ঐ নীতি নিয়ে চলছে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তা অনুসরণ করছে শ্রমিকশ্রেণী বা মেহনতি গরিব জনগণের স্বার্থে। এটাকেই সিপিএম নেতৃত্ব বলছেন, ''শ্রেণী অভিমুখ ঠিক রেখে উন্নয়ন।'' ভাষার মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে দেখা যাক আসল বস্তুটা কী।

উন্নয়নের মাধ্যমে 'শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ'

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, ''বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হচ্ছে উন্নয়নের মাধ্যমেও শ্রেণীসংগ্রামকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে।'' মুখ্যমন্ত্রী এখানে দুটি কথা বলেছেন — (১) শ্রেণীসংগ্রাম ও (২) উন্নয়ন। প্রথমত, শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের যে কথা তিনি বলেছেন, সেই সংগ্রাম কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে? বর্তমান শোষক ও শোষিতে বিভক্ত সমাজে শোষিতশ্রেণীর ওপর শোষণের বোঝা আরও চাপানোর উদ্দেশ্যে শোষকশ্রেণীর যে প্রচেষ্টা — তার বিকাশ ঘটানো, নাকি শোষকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের বিকাশ ঘটানো? বুদ্ধদেববাবু বাস্তবে কোন্ শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের কথা বলতে চেয়েছেন তার উল্লেখ করেননি। ধরে নিচ্ছি, তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু সিপিএম সরকারের গত ২৭ বছরের শাসনে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রাম শক্তিশালী হওয়া দূরের কথা, বরং মেহনতি জনগণের ঘাড়ে দেশি-বিদেশি পুঁজি আরও তীব্রভাবে চেপে বসেছে, শোষণ আক্রমণ আরও তীব্র হচ্ছে। হাজারে হাজারে শ্রমিক ছাঁটাই ও লক-আউটের শিকার হচ্ছে, স্বেচ্ছাবসর নিতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। কাজ হারানো শ্রমিক অনাহারে রোগে ভুগে মারা যাচ্ছে, কেউ বা আত্মহত্যা করছে। অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গি আন্দোলন চলবে না বলে সিপিএম সরকার হুমকি দিচ্ছে, গড়ে-ওঠা গণআন্দোলনগুলিকে পুলিশ দিয়ে, ক্রিমিনাল দিয়ে দমন করছে। মালিকশ্রেণী খুশি হয়ে সরকারকে বাহবা দিচ্ছে। এরই নাম কি শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামকে আরও বিকশিত করা? দ্বিতীয়ত, তাঁরা 'উন্নয়নে'র যে কথা বলছেন, এবং সেই উন্নয়নের যে মডেল তাঁরা দেখাচ্ছেন, সেসব তো কংগ্রেস, বিজেপি, চন্দ্রবাবু নাইডু'র পুঁজিবাদী উন্নয়নের নয়া উদারবাদী মডেল। উন্নয়নের এই মডেল দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের উন্নয়ন ঘটাবার স্লোগান তো তারাও দেয়। এবং তার ফলে শ্রমজীবী জনগণের উপর মালিকশ্রেণীর আগ্রাসী আক্রমণ যেমন অবধারিতভাবেই নেমে আসে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটছে কি? এরপরও সিপিএম নেতৃত্ব যখন উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের কথা বলেন, তখন তাকে চালাকি ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যায়?

সরকার নাকি পুঁজির চাপে

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, ''বর্তমান সময়ে ফিনান্স পুঁজি আমাদের ছেড়ে দেবে তা হয় না। কথা হল, পুঁজির সেই চাপকে অস্বীকার না করেও আমরা আমাদের শ্রেণী অভিমুখ ঠিক রাখতে পারছি কিনা।'' কি অদ্ভুত কথা! না চাইলেও নাকি তাঁদের উপর ফিনান্স পুঁজির চাপ রয়েছে এবং সেটা তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। আমরা তো দেখছি উল্টোটা। তাঁরাই বরং দেশে-বিদেশে ছুটছেন পুঁজির মালিকদের অনুরোধ-উপরোধ করে এ রাজ্যে আনার জন্য। বুদ্ধদেববাবু গত জানুয়ারিতে মালিকশ্রেণীর সভায় বলেছেন, তাঁরা বোকা নন। কথাটা এই অর্থে বলেছিলেন যে, কোন্ পুজোয় কী ফুল দিতে হবে তা তাঁরা জানেন। তাঁরা জানেন, পুঁজির দেবতাকে তুষ্ট করতে কী কী উপঢৌকন দিতে হয়। তাই মালিকদের তাঁরা কম পয়সায় জমি, বিনে পয়সায় জল ও কম দামে বিদ্যুৎ দিয়ে প্রলুব্ধ করছেন; শিল্পে উৎসাহদান প্রকল্পে তাঁরা খরচ করেছেন ৮৫৫ কোটি টাকা; বিপুল পরিমাণ কর মালিকদের তাঁরা ছাড় দিচ্ছেন; রাজ্যে যাতে শ্রমিক আন্দোলন না হয় এবং মালিকরা যাতে অবাধে লুণ্ঠন চালাতে পারে তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ফলে, 'শ্রেণী অভিমুখ ঠিক রাখতে' পারার যে কথা তিনি বলেছেন, তা একদিক থেকে তো ঠিকই; তবে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে নয়, মালিকশ্রেণীর দিকে অভিমুখ তাঁরা যথার্থই ঠিক রাখতে পেরেছেন।

কলকাতায় মালিকদের সভায় বুদ্ধদেববাবু

তাই মুম্বই, কলকাতাসহ দেশের নানা জায়গায় পুঁজিপতি-মালিকশ্রেণীর সভায় বুদ্ধদেববাবু হাজির হচ্ছেন এবং বোঝাচ্ছেন, পুঁজি বিনিয়োগের জন্য পশ্চিমবাংলাকে তাঁরা কত উপযুক্ত করেই না গড়ে তুলেছেন! তিনি রাজ্য সম্মেলনের বক্তৃতায় বলেছেন, ''কলকাতায় সি আই আই-এর পার্টনারশিপ সামিট হয়ে গেল; সেখানে ২৪টা দেশ এসেছিল। সি আই আই বলল, আমরা কলকাতায় করব এই সামিট। কী বলব তাদের? বলব কি যে, না, দরকার নেই চলে যান! ঠিক হবে সেই বলা?'' প্রশ্ন হল, হঠাৎ এ ধরনের প্রসঙ্গ তিনি তুললেন কেন? তুলছেন — কারণ, দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আসল প্রশ্নটিকে তিনি কৌশলে এড়িয়ে কর্মীদের ভাবনার মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছেন। দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, মালিকদের সভায় তাঁর ভূমিকা ও বক্তব্য নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি মালিকদের সভায় যেতেই পারেন, রাজ্যের আর্থিক বিষয়ে কিছু বলতেও পারেন, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলতে হবে কেন? সে কি মালিকদের খুশি করবার জন্য নয়? মালিকদের হাততালি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় গদগদ মুখ্যমন্ত্রী ওখানে তাহলে কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করলেন?

এই প্রশ্নগুলির সরাসরি জবাব না দিয়ে তিনি এমনভাবে বিষয়টি তুললেন এবং বললেন, যার দ্বারা মূল প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে যাওয়া হল। নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদেরও প্রতারিত করবার জন্য তাঁকে এই চালাকির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

বাছবিচার করে লগ্নীপুঁজির ব্যবহার

তিনি বলেছেন, 'লগ্নীপুঁজি আনছি বটে, কিন্তু তা বাছবিচার করে। যেখানে দরকার কেবল সেখানেই আনছি।' কোথায় তাঁর সরকার 'বাছবিচার' করছে? কী সেই 'বাছবিচার'? তাঁরা কি বলছেন যে, যেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বেশি সুযোগ সৃষ্টি হবে — কেবল সেইক্ষেত্রেই তাঁরা লগ্নীপুঁজি চান? তা তো তাঁরা বলছেন না। বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র — সব শিল্পেই তাঁরা লগ্নীপুঁজিকে ডাকছেন। তাঁরা একদিকে কেন্দ্রকে বলছেন, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারি পুঁজির কাছে বেচে দেওয়া চলবে না; অথচ তাঁরা নিজেরা ইতিপূর্বেই অতি লাভজনক সরকারি সংস্থা 'মিনিদ্বীপ চিংড়ি প্রকল্প' জাপানি পুঁজির কাছে বেচে দিয়েছেন। কেন দিলেন? এর নাম 'বাছবিচার'? পশ্চিমবঙ্গে নির্মাণশিল্পের জন্য তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার সেলিম গোষ্ঠীকে আনছেন। কেন, নির্মাণ শিল্প গড়ার জন্য এদেশে কেউ নেই? আসলে কোন বাছবিচারই তাঁরা করছেন না। দেশি ও বিদেশি পুঁজি পরস্পর গাটছড়া বাঁধায় তাঁরাও দেশি-বিদেশি — উভয় পুঁজির বন্দনায় সামিল হয়েছেন। 'বাছবিচারের' কথাটা নিছক লোক দেখানো ভড়ং মাত্র।

বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারের শর্তে ঋণ দেয়?

বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা এ রাজ্যে লগ্নীর প্রশ্নে বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, ''বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে। আমরা বলছি, তোমরা টাকা দিচ্ছ দাও, আমাদেরও দরকার। কিন্তু তোমরা শুধু জেনে নেবে, আমরা কবে টাকা শোধ দেব। এর বাইরে আর কোন কথা জানতে চাইবে না। জানতে চাইলে অবশ্যই বলব, চলে যাও।'' ঠিকই তো, একথা সকলেই জানে যে, যে কোন ঋণদাতা সংস্থাই ঋণ দেবার আগে জানতে চায় কবে ও কীভাবে তার ঋণ ও সুদ পরিশোধ করা হবে। সেই ঋণশোধের নিশ্চয়তা পেতেই তারা নানা শর্ত চাপায়। যে প্রকল্পের জন্য তারা টাকা দিচ্ছে সেটি রূপায়ণে তাদেরই পছন্দমত পরামর্শদাতা সংস্থা ও ব্যক্তি এবং নির্মাণ সংস্থাকে নিয়োগ করতে হবে, প্রকল্পের দ্রব্যসামগ্রী তাদেরই পছন্দের সংস্থা থেকে কিনতে হবে, ঋণগ্রহীতা সংস্থার পরিচালন খরচ হ্রাসের উদ্দেশে তার কর্মীসংখ্যা কমাতে হবে, প্রকল্পের কোন্ ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ খরচ করা হবে ইত্যাদি আরও অনেক শর্ত তারা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্পে এসব শর্ত যে কাজ করেছে, সেটাও অজানা নেই। ফলে, বিশ্বব্যাঙ্ক কোন শর্ত দেয়নি, তারা বুদ্ধদেববাবুদের কাছে এসে নতজানু হয়ে বসে সরকারেরই দেওয়া শর্তে ঋণ দিচ্ছে — এরকম একটি ডাহা মিথ্যে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আসলে ঋণের সঙ্গে দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের যে হীন জনস্বার্থবিরোধী শর্তাবলী তাঁরা মেনে চলেছেন, কৌশলে সেগুলিকে তিনি আড়াল করছেন। সৎ সাহস থাকলে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের বিষয়ে সরকারি শ্বেতপত্র তাঁরা প্রকাশ করুন। কলকাতা সহ রাজ্যের বহু এলাকা বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কী শর্তে, সর্বশিক্ষা ও ডিপিইপি'র নামে যে বিপুল টাকা বিদেশ থেকে নেওয়া হচ্ছে তার শর্তই বা কী — সব জানানো হোক রাজ্যবাসীকে। কারণ, রাজ্যবাসীর ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলে, রাজ্য চলে; সুদ সহ ঋণের টাকা মেটাতে হবে এই জনগণকেই। তাহলে ঋণের শর্তাবলী জনগণ জানতে পারবে না কেন? কেন এক্ষেত্রে সরকার গোপন বোঝাপড়ার নীতি নিয়ে চলবে?

> তাঁরা 'উন্নয়নে'র যে কথা বলছেন, এবং সেই উন্নয়নের যে মডেল তাঁরা দেখাচ্ছেন, সেসব তো কংগ্রেস, বিজেপি, চন্দ্রবাবু নাইডু'র পুঁজিবাদী উন্নয়নের নয়া উদারবাদী মডেল। উন্নয়নের পুঁজিবাদী মডেল দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের উন্নয়ন ঘটাবার স্লোগান তো তারাও দেয়। এবং তার ফলে শ্রমজীবী জনগণের উপর মালিকশ্রেণীর আগ্রাসী আক্রমণ যেমন অবধারিতভাবেই নেমে আসে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটছে কি?

সরকার নাকি উচ্ছেদবিরোধী

কলকাতার উন্নয়নের নামে সরকার ঋণ নিচ্ছে এবং তারই শর্ত হিসেবে তারা হাজার হাজার হকারকে উচ্ছেদ করছে, হাজার হাজার মানুষের বস্তি উচ্ছেদ করছে। ১৯৯৬ সালে 'অপারেশন সান সাইনের' নামে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও কান্তি গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে হাতিবাগান, গড়িয়াহাট, লেকমার্কেট ও কালিঘাট এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার হকারকে জীবিকাচ্যুত করে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

মোটেই অচেনা পথ নয়

তিনের পাতার পর

টালিনালা পরিষ্কার ও মেট্রোরেল সম্প্রসারণের অজুহাতে টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত খালের দু'পাশের ১৪০০ পরিবার ও ৩১৬টি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; অথচ এখানকার বাসিন্দাদের বাসস্থানে আইনসম্মত বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিল, পানীয় জলের সরকারি ব্যবস্থা ছিল, ভোটার তালিকায় নামও ছিল। ২০০২ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বেলেঘাটা খালপাড়ের ৪ হাজার বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ২০০ বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্কুলবাড়িটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুলিশি জুলুম চালিয়ে হাজার হাজার খালপাড়বাসীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাজারহাটে 'নিউ টাউন' গড়বার অজুহাতে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৬১৭০ জন প্রান্তিক চাষীকে, ২১০৫ জন ছোট চাষীকে, ৪৬০৫ জন ভূমিহীন চাষী ও ৪ হাজার জেলেকে। দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, উন্নয়নের মানে যদি গরিব হকার ও জনবসতি উচ্ছেদ হয়, তবে সেই উন্নয়নের দরকার কী? এই প্রশ্নের জবাব দিতেও বুদ্ধদেববাবু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় ফ্লাইওভার গড়ছি, আবার বস্তিবাসীরা যাতে উৎখাত না হয়ে যান তাও দেখছি। দিল্লী, মুম্বইয়ের মত হচ্ছে না এখানে।' অথচ বাস্তবে তাঁরা ঠিক উল্টোটাই করছেন। দিল্লী, মুম্বইতে কংগ্রেস বিজেপি যা করছে, সিপিএম সরকার এ রাজ্যেও ঠিক একই কাজ করছে। ঋণের শর্তে সবাই বাঁধা; ব্যতিক্রম হবার জো নেই। বরং উচ্ছেদে অমানবিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা তো কংগ্রেস-বিজেপি'র থেকেও সরেস। খবরে প্রকাশ, বেলেঘাটা খালপাড়ের বসতি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে বলেছিল। তাতেও রাজি হয়নি সিপিএম সরকার। কারণ কী? তাঁদের যুক্তি, বস্তি উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ একবার চালু হয়ে গেলে, বস্তি উচ্ছেদের সব ক্ষেত্রেই তা দিয়ে যেতে হবে; অতএব দেওয়া চলবে না। এর অর্থ, আরও বহু বসতি উচ্ছেদের পরিকল্পনা তাদের আছে।

> একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যে সরকারে গেলে শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখে কীভাবে সরকার পরিচালনা করতে হয় তার রোডম্যাপও আছে। মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতেই এদেশে তা তুলে ধরেছিলেন ১৯৬৭ সালে, এ রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়। একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল সরকারে না থাকলেও যেমন শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম পরিচালনা করবে, তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোন রাজ্যে সরকারে গেলেও সেই সংগ্রামকে আরও উজ্জীবিত করে তুলতেই সরকারকে ব্যবহার করবে। শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মাধ্যমে তা কার্যকরী করেও দেখিয়েছিল এস ইউ সি আই।

বৃহৎ পুঁজি, ক্ষুদ্রশিল্প ও কর্মসংস্থান

পুঁজি-নির্ভর শিল্পে কর্মসংস্থান হয় অতি সামান্য। এই সত্য পুরোপুরি জেনেও সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পায়নের জয়ঢাক বাজিয়েছে, দেশের ও বিদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের তাবড় তাবড় মালিকদের সাথে করমর্দনের ছবি প্রচার করে দেখাতে চেয়েছে, শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ কী প্রবল গতিতে এগোচ্ছে। এ ব্যাপারে সল্টলেকে বিশেষ 'ইন্‌ফোটেক' অঞ্চল গড়ে তাকে বিজ্ঞাপনের বিষয় করেছে। কিন্তু যে 'শিল্পায়নে' কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না, তাতে জনসাধারণের স্বার্থ কী? ক্রমেই যত স্পষ্ট হল যে, পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর এসব শিল্পে রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না এবং হবেও না, ততই বেকারদের 'শিল্পায়নে'র স্লোগানে ভোলানো কঠিন হল। তাই বুদ্ধদেববাবুরা এখন সৎ সেজে নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন, পুঁজি-নির্ভর শিল্প দিয়ে কর্মসংস্থান হবে না, ক্ষুদ্রশিল্প বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। বক্তৃতায় বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, 'কর্মসংস্থান হবে যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, তার প্রসারের দিকেও নজর দিতে হচ্ছে।' কী নজর তাঁরা দিয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্প চালু ছিল ৪০ হাজার ৫৪টি; তাঁদের রাজত্বে ২৯ হাজার ২১৫টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (ICSI Herald, Oct.-Dec, 2004)। এমনই তাঁদের নজর দেওয়া! সম্প্রতি সরকারি সংস্থা তন্তুজ ও তন্তুশ্রীকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন। এইভাবে ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারে তাঁরা নাকি কাজ করছেন!

স্বনিযুক্তিতে কর্মসংস্থান

তিনি বক্তৃতায় আরও বলেছেন, ''কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের অল্প পুঁজির 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' গড়ার কথা ভাবতে হচ্ছে, করতে হচ্ছে। এটাই তো বিকল্প।'' হ্যাঁ, কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারও 'প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা', 'স্বর্ণজয়ন্তী প্রকল্প' ইত্যাদি বহু বিকল্প বাতলেছে। এ আর নতুন কী! শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত করবার এইসব টোটকার দ্বারা যে বাস্তবে কোন সত্যিকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় না, যাচ্ছেও না — তা বুদ্ধদেববাবুরা খুব ভাল করেই জানেন। তাঁদের 'স্বনিযুক্তি প্রকল্পের' ফলশ্রুতিতে বেকার যুবকরা ব্যাঙ্কঋণের ফাঁদে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে এবং তারপর তাদের পিছনে সরকারই লেলিয়ে দিচ্ছে ব্যাঙ্ককর্তা ও পুলিশকে। বেকার যুবকদের এখন পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, কেউ কেউ জেলে পচে মরছে। অথচ সরকারি হিসেবে এই যুবকেরা আর বেকার নেই, তাদের কর্মসংস্থান হয়ে গেছে। এই তো তাঁদের কর্মসংস্থানের ছক।

শ্রমিকদের পি এফ

বুদ্ধদেববাবু বলছেন, ''অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, তাদের জন্য পি এফ-এর ব্যবস্থা করেছি আমরাই। কোথায় আছে এমন?'' খুব গর্ব তাঁর। অসংগঠিত কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে মাসে ২০ টাকার পি এফ ঘোষণা করে দিয়ে তাঁরা ঢাক পেটাচ্ছেন। অথচ তাঁরই রাজ্যে সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোটি কোটি টাকা মালিকরা মেরে দিয়ে বসে আছে — তার জন্য তাঁরা কী করছেন? পি এফ-এর টাকা মেরে দেবার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ স্থানে। রাজ্য সরকার চুপ করে আছে, মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। শুধু কি তাই? রাজ্য সরকার পরিচালিত শিল্প ও বিভিন্ন সংস্থার পিএফ-এর কোটি কোটি টাকা সিপিএম সরকার জমা দেয়নি। যেমন, রাজ্য সরকারের ১৩টি সংস্থার শ্রমিকদের প্রাপ্য পিএফ-এর ২৭ কোটি ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা রাজ্য সরকার নিজেই মেরে দিয়েছে। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় তাঁরা এমনই চ্যাম্পিয়ন !

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা প্রসঙ্গে

তিনি আরও বলেছেন, ''রাজ্যে ৫৬টা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা রাজ্য সরকারের। বছরে ৩০০ কোটি টাকা বেরিয়ে যায় এদের জন্য। একটা টাকাও আসে না। সমাজতন্ত্রেও কি এটা হয় নাকি?'' তাঁদের এই যুক্তির আসল মতলব হচ্ছে, জনগণের টাকায় গড়ে-ওঠা এই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে তাঁরা লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে দেশি-বিদেশি মালিকদের কাছে বেচে দেবেন। প্রথমত, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে মুনাফালাভের ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে চালানো হয় না; সমাজের সমস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার দৃষ্টিতেই দেখা হয়, লোকসান হলেও অন্যান্য খরচ কমিয়ে জনজীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উৎপাদন চালু রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলির পরিচালনায় আছেন বুদ্ধদেববাবুদের পছন্দেরই লোকজন। তাদের লাগামহীন দুর্নীতি ও অপদার্থতায় কারখানাগুলি ধুঁকছে। আগে তাঁরা সেই ব্যাধি দূর করার ব্যবস্থা করুন। তা না করে সেগুলি বেচে দেবার যুক্তি খুঁজছেন। আর, বেচে দেওয়াই যদি মতলব তবে অজুহাত খোঁজা কেন? সিপিএম নেতারা সরাসরি বলুন যে, তাঁরা কংগ্রেস-বিজেপি'র পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন; বলুন যে, জনগণের সম্পত্তিগুলো তাঁরা পুঁজিপতিদের উপঢৌকন দিয়ে গদি রক্ষার নিশ্চয়তা চান। এত কথার ম্যারপ্যাঁচ কেন?

কৃষক দরদ

বুদ্ধদেববাবু তাঁর সরকারের কৃষক-দরদ বোঝাতে সভায় আরও বলেছেন, ''এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি গড়তে অনেকে এসে ক্যাপটিভ ল্যান্ড চাইছে। তা দিতে গেলে আমাদের জমির মালিকানা বদলে দিতে হয়। তাতে প্রচুর গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই দিইনি।'' বাস্তবে, তাঁদের রাজত্বে কি 'জমির মালিকানা বদলে' যাচ্ছে না? সার-বীজ-ওষুধ-সেচ-বিদ্যুতের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে, অথচ বাজারে চাষীর ফসলের ন্যূনতম দাম পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তার ফলে একদিকে যেমন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে হতাশায় চাষীরা আত্মহত্যা করছে, তেমনি অন্যদিকে তারা পড়ছে ইঁটভাটা ও ফিসারিজ মালিকদের খপ্পরে। অলাভজনক চাষের পরিবর্তে লোভনীয় অর্থের বিনিময়ে চাষের জমি পরিণত হচ্ছে ইঁটভাটায় ও ফিসারিতে। জমির মালিকানা বদলে যাচ্ছে না? রাজ্যের জনগণনা রিপোর্ট ২০০১ থেকে দেখা যাচ্ছে, নিজস্ব জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যা ৩৮.৪% থেকে কমে হয়েছে ২৫.৪%; অন্যদিকে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৪১.৬% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯.৮%। অর্থাৎ জমি হারিয়ে খেতমজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সেই হারানো জমির মালিকানা কি বদলে যায়নি? রাজারহাটে উপনগরী গড়ার অজুহাতে যে ১৬,৮৮০ জনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের জমির মালিকানা কি বদলে যায়নি? বুদ্ধদেববাবুর সরকার তো গ্রামে জমির সিলিং তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যাতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা বড় বড় কৃষি ফার্ম তৈরি করে ফসল ফলিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে পারে। এটা কি জমির মালিকানা বদলে দেবার ব্যবস্থা নয়? এই ষড়যন্ত্রের ছক আড়াল করতে নিজ দলের নেতা-কর্মীদের সামনে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে কৃষক দরদের জয়ঢাক পেটাতে হল।

সম্প্রীতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও সংস্কৃতি

তিনি বলেছেন, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সুরক্ষা, উন্নত সংস্কৃতি'র কথা। যে রাজ্যের প্রাইমারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের প্রশ্নে জাতপাতের রেষারেষি, এক জাতের লোক রান্না করলে অন্য জাতের লোক খায় না, সব জাতের শিশুরাও এক পঙক্তিতে বসে খেতে পারে না — সেই রাজ্যে সম্প্রীতির গুণগান করতে বুদ্ধদেববাবুদের মুখে আটকাচ্ছে না, এটা লজ্জার কথা। হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলায় সম্প্রীতি ছিল। বামপন্থীরা তা নিয়ে গর্ব করত। কিন্তু গত ২৭ বছরে তাঁরা সেই সম্প্রীতির পরিবেশটাকেই ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। জাত-ধর্মের বিভেদ ঘুচিয়ে সকল মানুষকে এক সুরে গাঁথতে পারে যে গণআন্দোলন — তাকে তাঁরা পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে দমন করছেন এবং যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্প্রীতির পরিবেশকে রক্ষা করে — তাও তাঁরা গড়ে তোলেননি। সিপিএম নেতারা কেবল গায়ের জোরে ভোটে ক্ষমতা দখল করাকেই ধ্যানজ্ঞান করেছেন এবং বহুক্ষেত্রে ভোটের স্বার্থে জাত-ধর্মকেও তাঁরা ব্যবহার করেছেন। এমন অনুকূল পরিবেশ পেলে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য বিষ মাথা তুলবে না? ফুলে ফলে পল্লবিত হবে না? কাজে-কর্মে সম্প্রীতির পরিবেশকে তাঁরা নিজেরাই ধ্বংস করে চলেছেন, আর সভা সম্মেলনে সম্প্রীতি রক্ষার বক্তৃতা করছেন। এর চেয়ে দুমুখো নীতি, দ্বিচারিতা আর কী হতে পারে!

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সুরক্ষা? সিপিএম দল এবং তাদের সিটু'র যথেচ্ছাচার মেনে চললে, মালিকদের সঙ্গে যোগসাজসে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী তাদের কালাচুক্তি মেনে নিলে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সুরক্ষা আছে। রাজ্য সরকার সল্টলেক ও ফলতায় 'বিশেষ অর্থনৈতিক জোন' তৈরি করেছে এবং সেখানে মালিকদের যা খুশি করবার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে; শ্রমিকদের কোনপ্রকার দাবি ও আন্দোলন সেখানে নিষিদ্ধ। রাজ্যে শ্রমিকরা বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন করলে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার ঠিকেদারি তারা পালন করছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সুরক্ষা আছে বৈ কি!

আর উন্নত সংস্কৃতি? সে তো আছেই। সিপিএম সরকার এ রাজ্যে পাঁচতারা হোটেল, বার, ডিস্কো ঠেক, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে নাচের ঢালাও বন্দোবস্ত করেছে; সেই সঙ্গে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় রমরমিয়ে চলছে মদ জুয়া নোংরা ফিল্ম ও পত্রপত্রিকার ঢালাও স্রোত। এসবের গালভরা নাম তারা দিয়েছে, 'বিনোদন ও আতিথ্যমূলক ব্যবসা।' এর সঙ্গে নিয়মিত চলছে রবীন্দ্র সদনে কিংবা নন্দনে চলচ্চিত্র উৎসব ও কবিতা পাঠের আসর। ব্যস, উন্নত সংস্কৃতির জয়জয়কার! বুদ্ধদেববাবুরা যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ঠিকেদারি নিয়েছেন, সেই ব্যবস্থার পচাগলা দুর্গন্ধকেই উন্নত সংস্কৃতি বলে তাঁরা চালাচ্ছেন।

অচেনা পথ?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সমাজ পরিবর্তনের যে মূল লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যেই নাকি তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''কোন রোডম্যাপ নেই আমাদের কাছে।.... আগে কেউ এপথে হাঁটেও নি। অচেনা পথ।'' বুদ্ধদেববাবু যত হেঁয়ালি করে কাব্য করে কথা বলুন না কেন, এটা তাঁর ভাল করেই জানা যে, তাঁদের পার্টি ও সরকার যে পথে হাঁটছে — তা মোটেই অচেনা পথ নয়। ইতিপূর্বে বিশ্বের দেশে দেশে বহু দল ও সরকার সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের স্লোগানের আড়ালে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে গেছে এবং এখনও অনেকে করে চলেছে। সিপিএম সরকার সেই অতি চেনা পথ ধরেই হাঁটছে।

একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যে সরকারে গেলে শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখে কীভাবে সরকার পরিচালনা করতে হয় তার রোডম্যাপও আছে। মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক,

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতারণামূলক কেন্দ্রীয় বাজেট

একের পাতার পর

বর্তমান সরকারের বাধ্যতা ছিল ; বিশেষ করে সিপিএম-সিপিআই'র তো ছিলই। নাহলে এই সরকারের প্রতি তাদের সমর্থনটা তো বিরাট প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ায়। দলের সৎ কর্মী-সমর্থক ও প্রভাবিত জনসাধারণকে তারা আটকাবে কী দিয়ে? এসব কিছুকে খেয়ালে রেখেই বাজেট ভাষণের শুরুতে অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ''২০০৪-এর নির্বাচনে জনগণ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন; তাঁরা চেয়েছিলেন — নতুন নেতৃত্ব, নতুন সরকার, নতুন নীতি, সাধারণ জনগণের প্রতি বিশেষ নজর...''। এভাবে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষার কথা দিয়ে অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, বাজেটে তাকে ন্যূনতম স্বীকৃতি কি তাঁরা দিয়েছেন? বাস্তবে বাজেটে জনগণ কী পেয়েছে?

কেন্দ্রীয় সরকার কী করতে পারতো

একথা ঠিক যে, জনগণের সকল দুঃখদুর্দশার মূল কারণ যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তাকে বজায় রেখে জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সরকার একেবারে কিছুই করতে পারে না। বাজেট হল সরকারের বার্ষিক আয়ব্যয়ের নকশা। আয়টা সরকার কীভাবে কতটা করবে এবং সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্য কী — তা দিয়ে সরকারের চরিত্র বোঝা যায়। সরকার প্রকৃত জনমুখী হলে, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রশ্নে সৎ হলে এবং মালিকশ্রেণীর কাছে নিজেদের পুরোপুরি বিক্রী না করে দিলে জনগণের ওপর চাপানো দুঃসহ করের বোঝা খানিকটা হলেও লাঘব করতে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সম্ভবমতো কমিয়ে দরিদ্র মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে, সরকারি ভর্তুকির সুফল যাতে গরিব মানুষ পায় তার ব্যবস্থা করতে এবং গ্রামোন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক খাতে কিছু ব্যয় বাড়াতে পারে; কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, কিছুটা অর্থবরাদ্দ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতারণা

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল তা-ই। অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে মহা আড়ম্বরে বলেছেন — তাদের সরকারের ''ন্যূনতম সর্বসম্মত কর্মসূচির লক্ষ্য হল, গরিবের স্বার্থে সরাসরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। দেশের অর্থনীতির বর্তমান সুসময়ে দারিদ্র্য এবং বেকারি দূর করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করাও সম্ভব।'' একথাটা যদি প্রতারণা না হয়, তাহলে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ীই, বেকারি ও দারিদ্র্যমোচনের ক্ষেত্রে অর্থাভাব হবে না। এসব লম্বাচওড়া কথা বলার পর তিনি এ ব্যাপারে আরও লম্বাচওড়া ব্যয়বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন এমন ভাব দেখিয়ে, যেন সামাজিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁরা বিরাট একটা কিছু করেছেন। কেন্দ্রের দোসর বামপন্থীরাও ভাব দেখাচ্ছিল, যেন তাদের চাপেই সরকারের দৃষ্টি গরিবদের দিকে ঘুরে গিয়েছে। অথচ সেচ-সার-বীজের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, কলকারখানা প্রতিনিয়ত বন্ধ হওয়া, শিক্ষায় বিপুল ফি-বৃদ্ধি, চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃত সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি বাজেটে কোন নজরই দেওয়া হয়নি। একশো দিন কাজের আইনগত অধিকার দেওয়ার জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করা হয়নি। বাস্তবে তাঁরা যা করেছেন, তা হল, শুধুমাত্র কতকগুলি গ্রামীণ ক্ষেত্রে এবং সামান্য কিছু স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দবৃদ্ধির ফাঁকা ঘোষণা। আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু করেই, বাস্তবে সেটাও ফাঁকি ছাড়া কিছুই না, তাঁরা গোটা সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যয়বৃদ্ধির লোকঠকানো প্রচার করে চলেছেন। প্রতারণার কৌশলটা তাঁরা ভালই আয়ত্ত করেছেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ন্যূনতম সর্বসম্মত কর্মসূচি রূপায়ণে ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় ১২,৫৩২ কোটি টাকা, গ্রামোন্নয়ন খাতে ১৩,৮৮৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮,৩৩৪ কোটি টাকা, ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ২,২০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,৭৫০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতে ৮,৪২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। গ্রাম এলাকা ও শহরের বস্তি এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণে ৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। ভারতনির্মাণ কর্মসূচি ঘোষণা করে প্রায় কল্পতরুর মতো গ্রামে এক কোটি কর্মসংস্থান, গরিবদের জন্য ৬০ লক্ষ নতুন বাড়ি, ৭৫ লক্ষ গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ৬৬,৮২২টি গ্রামে টেলি যোগাযোগ নির্মাণ প্রভৃতি প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। একে দেখিয়েই পরদিন আনন্দবাজার লিখেছে, ''জনতার স্বার্থে সামাজিক খাতে বিপুল টাকা।'' গণশক্তি (১.৩.০৫) লিখেছে — ''কর্মসংস্থান বিকাশ, বিশেষ করে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি যে গুরুত্ব পেয়েছে তাতে অভিমুখের পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে পলিটবুরো।''

কিন্তু এই নিকৃষ্ট প্রতারণার প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়তে দেরি হয়নি। বাজেট পেশের পর দু-রাত কাটতে না কাটতেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং ধাপ্পার মুখোস খুলে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা ''অঙ্কের খেলা'' ছাড়া কিছু নয়। ''গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলে অর্থমন্ত্রী স্রেফ ধোঁকা দিয়েছেন।'' গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর এই বক্তব্য ২ মার্চ সমস্ত প্রধান প্রধান দৈনিক কাগজে বেরিয়েছে। ৩ মার্চ বর্তমান পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করা হয়েছে — ''দেখা যাচ্ছে, গ্রামোন্নয়নের জন্য চিদাম্বরম যে ১৮ হাজার ৩৫৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন, খাতায়-কলমে তা গত বছরের বরাদ্দের চেয়ে ৬,৮৯৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বেশি হলেও বাস্তবে বরাদ্দ ঢের কমেছে। অর্থমন্ত্রীর এই খাতে ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির দাবিও ভূয়ো ...বাস্তবে গ্রাম ও গরিবের বরাদ্দই তিনি ছেঁটেছেন। অনুমান করা যায়, 'গরিব দরদী' বামপন্থীদের পূর্ণ সমর্থনেই চিদাম্বরম প্রতারণার এই কাজটি করেছেন।'' লক্ষণীয় ২রা মার্চ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর এই বক্তব্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে ছাপা হলেও ঐদিন বা পরদিনের গণশক্তি ঘুণাক্ষরেও এর উল্লেখ করেনি, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামের জন্য বাড়তি বরাদ্দ, মূলত যা দিয়ে এবারের বাজেটকে গ্রামমুখী, জনমুখী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে — সেটি পুরোপুরি ভাঁওতা। এই ভাঁওতাও নতুন নয়। '৯১ সাল থেকে একাধিক বাজেটে এভাবে জনস্বার্থে বড় বড় বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকঠকানো হয়েছে, কার্যত অর্থবরাদ্দই করা হয়নি। এমনকী গত বছর অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমই গ্রামীণ নানা খাতে যে বরাদ্দ ঘোষণা করেছিলেন, শেষপর্যন্ত তা দেননি।

সুবিধা হচ্ছে যে, জনসাধারণ এইসব অঙ্কের মারপ্যাঁচ বোঝেননা এবং তাঁদের স্মৃতিশক্তিও খুবই কম। এর সুযোগই শাসকদলগুলি নিয়ে জনগণকে ঠকায়। নাহলে দ্বিদলীয় রাজনীতি শাসকশ্রেণী দেশে চালু করতে পারত না।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ''টাকা বরাদ্দ করা মানেই কাজ হওয়া নয়''। যা তিনি বলেননি, তা হল, বাজেটে বরাদ্দ ঘোষণা করা, আর বাস্তবে টাকা দেওয়াও এক জিনিষ নয়। আয়ের সম্ভাব্য হিসাব দেখিয়ে বাজেটে যেসব খাতে ব্যয়বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হয়, সরকারি দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু খাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, আবার কোন কোন খাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, কতকগুলি খাতে প্রথমেই ব্যয় করা হয়, আর কতকগুলি খাতে টাকা থাকলে ব্যয় হয়, না হলে হয় না। সরকার বাজেট করার সময় আগামী বছরের একটা সম্ভাব্য আয় হিসাব করে। এরপর আয় অনুযায়ী বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক নানা খাতে টাকা যেমন প্রয়োজন প্রথমে দেওয়া হয়। জনকল্যাণমূলক খাতগুলিতে কিছু কিছু টাকা দেওয়ার পর বাকিটা দেওয়া নির্ভর করে সরকারের আয়ের উপর। বাজেটে প্রায়শই সরকার ইচ্ছা করে আয়কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়ে নানা জনকল্যাণমূলক খাতে বড় বড় বরাদ্দ ঘোষণা করে জনমুখিনতার ভান করে। তারপর বছর শেষে দেখা যায়, আয় কম হয়েছে এবং ঘোষিত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। মিলিটারি, আমলাতন্ত্র পরিচালনার জন্য বরাদ্দ ছাঁটাই হয় না, কারণ এসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া থাকে। আয় কম হওয়ার অজুহাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়, বা বরাদ্দ দেওয়া হয় না গ্রামোন্নয়ন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, বৈদ্যুতীকরণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক খাতে। গত বছরও তাই-ই ঘটেছে। ২০০৪-০৫ সালের বাজেটে সরকারের কর আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩১,৭৭৩৩ কোটি টাকা। বাস্তবে আদায় হয়েছিল ৩০,৬০২১ কোটি টাকা। ১১,৭১২ কোটি টাকা আয় কম হয়েছিল। এবারেও ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অর্থমন্ত্রী যে আয় দেখিয়েছেন বাস্তবে তা হবে না। আমরা জানি, হার্ভার্ড পাশ অর্থমন্ত্রী অজ্ঞ নন যে ভুলক্রমে বাড়তি আন্দাজ করবেন। আসলে সবটাই আটঘাট বেঁধে করা। বাড়তি সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়ন খাতে বিরাট বরাদ্দ দেখিয়ে জনদরদী সেজে জনগণকে ঠকানো যাবে এবং সেটার জোর প্রচারও হবে। অথচ, বছর শেষে আয় হয়নি বলে বরাদ্দ ছাঁটাই হবে, কিন্তু সেটা আর জনসাধারণ জানতে পারবে না। এসব ভেবেই পরিকল্পিতভাবে অর্থমন্ত্রী জনগণকে প্রতারিত করেছেন এবং সেই প্রতারণায় জেনেশুনে মদত যুগিয়েছে সিপিএম, সিপিআই।

বাস্তবে ভর্তুকি কমানো হয়েছে

গণদাবীর ১৮-২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছিলাম — ''ভর্তুকি দিতে দিতেই সরকার ফতুর হয়ে যাচ্ছে'' — সুপরিকল্পিত এই প্রচারটা নিছক মিথ্যা। নয়া আর্থিক নীতিতে ভর্তুকি ছাঁটাইয়ের যে ধারা চলছিল — বিজেপি যেটা গত পাঁচ বছর অব্যাহত রেখেছিল — এবারও সেই ধারা বজায় রেখে ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে নগণ্য। সরকারের মোট ব্যয় এক টাকা ধরলে ঋণের সুদ বাবদ খরচ হচ্ছে ২২ পয়সা, অথচ ভর্তুকি বরাদ্দ মাত্র ৭ পয়সা। ২০০৩-০৪ সালে বিজেপি'র শেষ বাজেটেও ভর্তুকি ছিল ১০ পয়সা। কংগ্রেস-সিপিএম ইউপিএ সরকার ২ বছরে সেটা ৭ পয়সায় টেনে নামিয়েছে।

এবছর কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ভর্তুকি ঘোষণা করা হয়েছে ৪৬,৫১৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২,৯৯৮ কোটি টাকা বেশি। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার কত? সরকারি হিসাবে গড়ে পাঁচ শতাংশের বেশি, বাস্তবে তা আরও বেশি। কাজেই মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি বিচারে নিলে বাস্তবে ভর্তুকি কমানোই হয়েছে। টাকার অঙ্কে ২,৯৯৮ কোটি টাকা ভর্তুকি বাড়ানো হলেও শুধু সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৬,০০০ কোটি টাকা, যা ভর্তুকিবৃদ্ধির দ্বিগুণ। তাছাড়া এও লক্ষণীয় যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা — যেগুলি না হলে মানুষ বাঁচতে পারেনা — সেগুলি গরিবের নাগালের মধ্যে আনার লক্ষ্য থেকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে না। ভর্তুকির লক্ষ্য, কৃষি ও শিল্পপুঁজিপতিদের পকেট ভরানো। বিগত বছরগুলির মতো এবারও প্রধান দুটি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিতেই বরাদ্দ প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর একটি হল সার, যাতে ভর্তুকি ১৬,২৫৪ কোটি টাকা; অপরটি খাদ্য, যাতে ভর্তুকি ২৬,২০০ কোটি টাকা। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বাজারে সার বা খাদ্যের দাম কমছে না। সারের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে, রেশনে খাদ্যদ্রব্যের দাম সরকারই দফায় দফায় বাড়িয়ে খোলাবাজারের দামের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। প্রশ্ন হল, ভর্তুকি সত্ত্বেও সার বা খাদ্যের দাম কম থাকছে না কেন? কোথায় যাচ্ছে ভর্তুকির টাকা? আসলে বাজারদরের ওপর কোন কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ না রেখে সারে ভর্তুকির টাকাটা সরকার দেয় সার কারখানার মালিকদের। সারের উৎপাদন খাতা- কলমে দেখালেই, উৎপাদন অনুযায়ী ভর্তুকি তারা পেয়ে যায়, যেটা তারা পকেটস্থ করে। এমনকী কাগজে-কলমে বাড়তি উৎপাদন দেখিয়ে ভর্তুকির টাকা তারা আত্মসাৎও করে। সার তারা বিক্রি করে ইচ্ছামতো দরে এবং তা ক্রমাগত বাড়ায়। খাদ্যে ভর্তুকির সুফলটাও পকেটস্থ করে কৃষিপুঁজিপতিরা ও কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। খাদ্যে ভর্তুকির টাকা দিয়ে রেশনে চাল, গম, ডাল, চিনির দাম কম রাখলে ও সরবরাহ বাড়ালে সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও উপকৃত হত। কিন্তু সরকার তা করে না। দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় যে গম কৃষিপুঁজিপতিদের সস্তায় বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে বেচতে হতো, সেই গম কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকির টাকা দিয়ে বেশি দরে কিনে সস্তায় পশুখাদ্য হিসাবেই বিদেশে বিক্রি করে। তাই, রেশন কার্যত উঠে যাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যে ভর্তুকি বজায় রাখা হয়েছে জনস্বার্থে নয়, বৃহৎ কৃষিপুঁজিপতিদের স্বার্থে — যেমন সারে ভর্তুকি রাখা হয়েছে মূলত সার কারখানার মালিকদের স্বার্থে। সরকার নিজেই স্বীকার করে ভর্তুকির দ্বারা গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছে না। প্রশ্ন হল, তাহলে গরিব যাতে ভর্তুকির দ্বারা উপকৃত হয়, তেমন ব্যবস্থা তারা করছে না কেন? কারণ এক্ষেত্রেও মালিকদের সাহায্য করাটাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। গরিব এই ভর্তুকির উচ্ছিষ্ট হিসাবে কখনও কখনও পায় ছিটেফোঁটা।

মালিকশ্রেণীকে বিপুল ছাড়

এইভাবে গরিব জনসাধারণকে প্রতারণা করে মালিকশ্রেণীকে দরাজ হাতে ছাড় দিয়েছেন চিদাম্বরম। কোম্পানি কর, অন্তঃশুল্ক, আমদানি শুল্কে ছাড় দিয়েছেন, উচ্চ আয়ের লোকেদের জন্য আয়কর রেহাই দিয়েছেন। ফলে একচেটিয়া মালিকরা খুব খুশি। এমন ''গ্রামমুখী'' বাজেটে তাদের কোন আপত্তি নেই। মালিকদের কত হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে? আমরা গণদাবীর ১১-১৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এর কায়দা-কৌশলের আলোচনায় দেখিয়েছিলাম যে, কত ছাড় দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণটা সরকার বলে না, শতাংশের হিসাব দিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়ে রাখে, যাতে মানুষ সরাসরি হিসাবটা বুঝতে না পারে। বাজেটের পরদিন সিপিআই সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন — এবছরের বাজেটে মালিকদের ৪৫ হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মালিকদের জন্য দেওয়া কর ছাড়টা মালিকরা কিন্তু সরাসরি নগদে পাবে। কারণ মালিকরা সরকারকে কর কম দেবে, এবং বাড়তি টাকাটা লাভের ঘরে সরাসরি জমা হবে, তাদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। এ ব্যাপারে বাজেটে অর্থবরাদ্দের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে না। কারণ, ছাড় পাওয়ার সঙ্গে সরকারের আয় কম হল কিনা তার কোন সম্পর্ক নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার এবার পেট্রল-ডিজেলের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে বলে দিয়েছে, এজন্য বাজারে তেলের দাম কমবে না। একচেটিয়া তেল ব্যবসায়ী বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী এর সুযোগ পাবে, বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের উপর কর কমায় এবং দেশের বাজারে দাম না কমায়, তাদের আমদানি খরচ কমবে, কিন্তু বিক্রির দাম একই থাকবে — তাতে লাভের বহর

সাতের পাতায় দেখুন

মোটেই অচেনা পথ নয়

চারের পাতার পর

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতেই এদেশে তা তুলে ধরেছিলেন ১৯৬৭ সালে, এ রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়। একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল সরকারে না থাকলেও যেমন শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম পরিচালনা করবে, তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোন রাজ্যে সরকারে গেলেও সেই সংগ্রামকে আরও উজ্জীবিত করে তুলতেই সরকারকে ব্যবহার করবে। শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মাধ্যমে তা কার্যকরী করেও দেখিয়েছিল এস ইউ সি আই। তবে তাতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের পিঠ চাপড়ানি বা হাততালি পাওয়া যায় না, 'দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী'র শিরোপাও মিলবে না, শিল্পপতিদের অভিনন্দন ভরা ২২ হাজার টাকার মালাও রাজ্য দপ্তরে আসবে না, কিংবা নির্বাচনী তহবিলে শিল্পপতিদের দেওয়া দানও এসে ঢুকবে না। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তর ও তার শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর ক্ষেত্রে যা পাওয়া গিয়েছিল, তাহল, একদিকে শ্রমিক তথা মেহনতি জনগণের প্রাণভরা ভালবাসা ও অভিনন্দন এবং অন্যদিকে টাটা- বিড়লা সহ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের লাগাতার ক্ষিপ্ত কুৎসা ও ষড়যন্ত্র। পরিণতিতে, মালিকদের খুশি করতে ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তরটি এস ইউ সি আইকে না দিয়ে সিপিএম দখল করে এবং শ্রমিক স্বার্থরক্ষার নীতিগুলিকে বিসর্জন দেয়। এই তো ইতিহাস। তাহলে 'রোডম্যাপ' আছে, বুদ্ধদেববাবুরা সেই পথে হাঁটবেন না মালিকশ্রেণী অসন্তুষ্ট হবে — এই ভয়ে। যেকোন মূল্যে গদীতে টিকে থাকতে হবে, আর সেজন্য মালিকশ্রেণীকে তুষ্ট রাখতে হবে, এটাই তাঁদের লাইন। অন্যদিকে শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আপসহীন গণসংগ্রাম-শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া — এস ইউ সি আই-এর লাইন — শোষণমুক্তির রোডম্যাপ। সিপিএম-এর সৎ কর্মী-সমর্থকদের বেছে নিতে হবে — কোন্ লাইন, কোন্ রোডম্যাপ ধরে তাঁরা হাঁটবেন।

শ্রমিকশ্রেণীর দলের আবরণ নিয়ে যে দলগুলি মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে, শ্রমিকশ্রেণীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেনিন বহু আগেই তাদের সম্পর্কে বলে গেছেন, 'এরা মেষের চামড়া আচ্ছাদিত নেকড়ে'। এরা হচ্ছে 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট — অর্থাৎ কথায় সমাজতন্ত্রী এবং কাজে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঠিকেদার। স্ট্যালিন বলেছিলেন, 'এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যায় না।' পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এখন এমনই ভয়াবহ সঙ্কটের আবর্তে পড়েছে যে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের আর ছদ্মবেশে থাকবার জো নেই। দ্রুত ছদ্মআবরণ খুলে ফেলে সরাসরি মালিকসেবায় তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে। ফলে, দুটো পক্ষ এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। হয় মালিকশ্রেণীর দাসত্ব করো, নয়তো শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রাম করো। মাঝামাঝি অবস্থানের কোন উপায় নেই। রাজ্য সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা নিরুপম সেন সেকথা স্বীকারও করেছেন। তাঁর কথায়, ''পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া এড়িয়ে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক এমনকি বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচিতে প্রদত্ত কোনও বিকল্পের ধারণা বাস্তবানুগ নয়'' (আনন্দবাজার ১০-২-০৫)।

সি পি এম সরকার গত ২৭ বছর ধরে যে বিকল্পের স্লোগান দিয়ে চলেছে তা যে বাগাড়ম্বর মাত্র — নিরুপমবাবুর কথায় আছে তারই স্বীকৃতি। কিন্তু দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের বামপন্থী মানসিকতাকে তাঁদের ভয়। তারা এমন সব প্রশ্ন তুলছে, যা সিপিএম নেতাদের চরম অস্বস্তিতে ফেলছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুকে তাঁর জবাবী ভাষণে কথার ধূম্রজাল বিস্তার করে সেই 'বিকল্পের'ই জয়গান করতে হয়েছে। গত ২৭ বছর ধরে এস ইউ সি আই বারে বারে এটাই দেখিয়ে আসছে যে, রাজ্য সরকার যে উন্নয়নের মডেলকে বিকল্প বলে প্রচার করছে, তা কোন বিকল্পই নয়, অন্যান্য রাজ্যের সরকারগুলোও একই মডেল নিয়ে চলছে। এই অবাম ও দক্ষিণপন্থী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ও ক্রিমিনালদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তারা শ্রমজীবী জনগণের দাবিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। রূঢ় বাস্তবের অভিজ্ঞতায় সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকদের উপলব্ধিও ক্রমশ প্রাঞ্জল হয়ে উঠছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী অবাম শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ- কৃষি ও শিল্পনীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা আন্দোলনে তাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করছেন। কেউ কেউ সক্রিয়ভাবেও এগিয়ে এসেছেন। অনেকে সিপিএম পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এখনও একটা বিরাট সংখ্যক বামপন্থী মানসিকতার মানুষজন সিপিএমের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন; আশা করি, দ্রুত তাঁরাও সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হবেন এবং শোষণমুক্তির প্রকৃত 'রোডম্যাপ' ধরে সত্যিকারের বামপন্থী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলবেন।

বেহালা কলেজে নির্বাচন ঘিরে
এসএফআই-এর সন্ত্রাস

বেহালা কলেজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে সমগ্র বেহালা এলাকা জুড়ে এসএফআই গুণ্ডাবাহিনী সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন পত্র তুলতে গেলে প্রথম বর্ষের একজন এআইডিএসও কর্মীকে এসএফআই-এর গুণ্ডারা বাথরুমে বন্ধ করে প্রচণ্ড মারধোর করে। সে এখন কানে শুনতে পাচ্ছে না। ২৪ তারিখ এসএফআই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য মনোনয়ন পত্র তোলার অপরাধে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে মারধোর করা হয়। ঐ দিনই কলেজ গেটে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার পর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী এআইডিএসও'র কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড অনন্যা নাইয়া বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় সিপিএম-এর বাইকবাহিনী কলেজ গেট থেকে তাকে অনুসরণ করে। বেহালা ১৪নং বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে তাকে এবং তার সাথী প্রাক্তন ডিএসও সদস্য কমরেড সুকান্ত সিকদারকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পেটাতে থাকে। কমরেড অনন্যা নাইয়াকে মারতে মারতে তার ওড়না ছিঁড়ে দেয়, সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে এবং ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। কমরেড সুকান্ত সিকদারকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় জনসাধারণ এবং দোকানদারদের প্রতিবাদের সামনে তারা তখন পালিয়ে গেলেও পরের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে আবার ছাত্ররা আক্রান্ত হয় কলেজের মধ্যেই। বিকালে বেহালা ট্রামডিপোর কাছে জেমস্ লঙ সরণীর উপর এআইডিএসও'র কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অতনু নাইয়াকে এই বাইকবাহিনী আবার আক্রমণ করে। এই ঘটনা '৭২-'৭৭ সালের কংগ্রেসী জমানার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুলিশের কাছে বার বার জানানো সত্ত্বেও এই আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী সিপিএম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর নেতা অরবিন্দ বসু এবং যিশুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। একজন ছাত্রীকে প্রকাশ্য রাস্তায় বিকাল তিনটার সময় ১০/১২ জন ধরে মারল, তারও কোন প্রতিকার পুলিশ করেনি।

রাজ্য জুড়ে যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সিপিএম ফ্রন্ট তৈরি করেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বেহালা কলেজে সন্ত্রাস বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ছাত্রদের সমর্থন হারিয়ে যেনতেন প্রকারেণ ছাত্র সংসদের দখল পেতে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেভাবে কলেজ থেকে বহুদূরে এসে সিপিএম-এর বাইকবাহিনী কলেজ নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রকর্মীদের পিটিয়ে যাচ্ছে, তা এই সন্ত্রাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এসএফআই এবং তাদের অভিভাবক সিপিএম জানে রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং দিশাহারা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের এবং ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের একমাত্র শক্তি আজ এআইডিএসও। বৃহত্তর ছাত্রসমাজ ক্রমাগত আন্দোলনের শক্তি হিসাবে এআইডিএসও'র সাথে যুক্ত হচ্ছে। তাই এই আক্রমণ।

মেদিনীপুরে ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

মেদিনীপুর জেলায় অস্বাভাবিক বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ও মেছেদায় বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা অবস্থানে বলেন, অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুরের ভাড়া আগেই বেশি ছিল। তৎসত্ত্বেও এ জেলায় ভাড়া বাড়ানো হলো মালিকদের অধিক মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যাত্রীদের সমস্যাগুলি সমাধানের কোন উদ্যোগ নেয়নি রাজ্য সরকার বা প্রশাসন। তিনি বাসযাত্রীদের বর্ধিত ভাড়া বয়কট করার আহ্বান জানান।

রাত ১১টা পর্যন্ত মেছেদা স্টেশনে যাতায়াতের জন্য বাস চালু করা, বাসরাস্তাগুলি সারানো, বাসকর্মচারীদের স্থায়ী চাকরি, পিএফ চালু করা প্রভৃতি দাবি অবস্থান মঞ্চ থেকে করা হয়। এই অবস্থানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানিক মাইতি, তপন ভৌমিক, তমলুক লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি, জ্ঞানানন্দ রায় প্রমুখ।

মেছেদার গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আশুতোষ সামন্ত, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মন্মথ দাস সহ আরও অনেকে।

পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু
ভবানীপুর থানায় বিক্ষোভ

ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া রোডের বাসিন্দা ফুটপাতে ফল বিক্রেতা বীরবাহাদুর শাহ'র ১৫ বছরের কন্যা সুনীতা শাহ, ঐ পাড়ারই রাজকুমার আগরওয়ালের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত। ২ মার্চ সকালে ঐ বাড়িরই ছাদে জলের ট্যাঙ্কের সংযোগকারী পাইপের সাথে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় সুনীতার মৃতদেহ পাওয়া গেলে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং হত্যার অভিযোগে আগরওয়াল পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পরে কোনও তদন্ত না করেই পুলিশ জানায় যে, সুনীতা আত্মহত্যাই করেছে। পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে পুলিশ এলাকার বেশ কিছু যুবককে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করেছে।

ঘটনার সংবাদ পেয়েই সারা বাংলা পরিচালিকা সমিতির পক্ষ থেকে এলাকায় যাওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে ৩ মার্চ ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৪ মার্চ আলিপুর কোর্টে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া প্রতিবাদী যুবকদের জামিনের জন্য চেষ্টা করা হয়। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও ৫ মার্চ ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

ধনিয়াখালী থানা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিপুল উৎসাহে অ্যাবেকা'র ধনিয়াখালী থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ধনিয়াখালী ইস্টার্ন কোল্ড স্টোরেজে। ২৮০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আইনজীবী কেশবচন্দ্র দাস। সভায় মূল প্রস্তাব এবং সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নীলরতন পাকিরা ও আনন্দ সাঁতরা। জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ছাড়াও জেলা কমিটির সহ- সভাপতি মহাদেব কোলে এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মণিমোহন ঘোষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস।

শ্রী বিশ্বাস তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সংগঠনের উপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে তাকে সাহসের সাথে গ্রহণ করে, দেশের সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ ব্যবহারের অধিকারকে বজায় রাখতে সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করবার লড়াইয়ে সকলকে সামিল হতে আহ্বান জানান। সভায় সুনামি দুর্গতদের জন্য সংগৃহীত অর্থ এবং সদস্য চাঁদা বাবদ টাকা রাজ্য সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুনরায় কেশব চন্দ্র দাসকে সভাপতি এবং নীলরতন পাকিরা ও আনন্দ সাঁতরাকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪৭ জনের শক্তিশালী থানা কমিটি গঠিত হয় এবং সকলেই দিল্লী অভিযানে সামিল হতে নাম নথিভুক্ত করেন।

শ্রীরামপুরে কনভেনশন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায় অ্যাবেকা'র শ্রীরামপুর শাখার উদ্যোগে শ্রীরামপুর বল্লভপুর স্কুলে শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকের উপস্থিতিতে এক বিদ্যুৎগ্রাহক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ প্রবীর বিশ্বাস।

কনভেনশনে শ্রীরামপুরে পূর্ণাঙ্গ রিজিওনাল অফিসের দাবিতে এবং নতুন করে ইউনিট প্রতি ৪০ পয়সা ও সেস্ বসানোর প্রতিবাদে ২টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিবাজী দে। তিনি বলেন, বিদ্যুতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণ বিদ্যুৎক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের নীতি প্রবর্তন। এই নীতি শুরু হয় মনমোহন সিংহ অর্থমন্ত্রী থাকার সময় থেকে। পরবর্তীকালে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার এই নীতিকে আইনি রূপ দিয়ে চালু করে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। বর্তমান কংগ্রেস সরকার এই আইনকেই রূপায়ণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার মুখে এই আইনের বিরোধিতা করলেও তারাই ভারতবর্ষে প্রথম এই আইনকে চালু করেছে। এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি এই নীতি বাতিলের দাবিতে আগামী ২২ মার্চ অ্যাবেকার ডাকে পার্লামেন্ট অভিযানে সকলকে অংশ নিতে আবেদন করেন। কনভেনশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির পক্ষে মণিমোহন ঘোষ। কনভেনশন থেকে ডঃ তারাপদ চট্টোপাধ্যায়কে প্রধান উপদেষ্টা করে ৩১ জনের শ্রীরামপুর অ্যাবেকা শাখা কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়ায় দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত

কমরেড নারায়ণ কুইরী স্মরণে সভা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানার সেরেংডি অঞ্চলের এস ইউ সি আই-এর প্রবীণ সদস্য কমরেড নারায়ণ কুইরী প্রকাশ্য দিবালোকে এক কুখ্যাত সমাজবিরোধীর হাতে খুন হন। তাঁরই স্মরণে ২৫ ফেব্রুয়ারি ঐ এলাকার শশ মোড়ে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র বাগমুণ্ডি থানার প্রায় সমস্ত অঞ্চল তো বটেই, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষ প্রাণের আবেগ থেকে এই সভায় যোগ দেন।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে যে মুষ্টিমেয় কমরেড বাগমুণ্ডি থানায় সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন কমরেড নারায়ণ কুইরী তাঁদের অন্যতম। পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম হাসিমুখে গ্রহণ করে এই কমরেড সামান্য একজন গরিব সব্জিবিক্রেতা থেকে হয়ে ওঠেন সবার প্রিয় 'নারানদা'। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি কোনদিন পিছপা হননি। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মত। দিবারাত্রি সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ে থাকতেন। দলমতের বেড়া তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁর এই হত্যাকাণ্ডে এলাকার মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মহিলা থেকে শিশু, বৃদ্ধ থেকে যুবক সকলেই এসেছেন স্মরণসভায় যোগ দিতে, বুকভরা কান্না নিয়ে তাঁদের প্রিয় 'নারাণদা'কে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

এলাকায় এস ইউ সি আই দলের বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক কমরেড সুবর্ণ কুমারের সভাপতিত্বে বিকাল ৪টায় সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই কমরেড নারায়ণ কুইরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য, পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড কেনারাম মণ্ডল, রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ, কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ও স্মরণসভার প্রধান বক্তা কমরেড দীপঙ্কর রায়। এছাড়াও মাল্যদান করেন বিভিন্ন লোকাল কমিটির সদস্যবৃন্দ, গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যদলের নেতৃবৃন্দ।

স্মরণসভায় কমরেড নারায়ণ কুইরীর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড স্বপন ঘোষ। তিনি বলেন, নারায়ণদার মৃত্যু আমাদের দলের কাছে এক বিরাট আঘাত। তিনি শুধুমাত্র দলের সম্পদ ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন এলাকার সম্পদ। আমি নারায়ণদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। বক্তৃতা দেওয়ার মত মনের অবস্থা আমার নয়। কিন্তু আমরা যারা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র তারা জানি, শোকের জন্য কাজ বসে থাকতে পারে না। বুক বেঁধে আবার আমাদের কাজে নামতে হয়। তিনি বলেন, কমরেড নারায়ণ কুইরীর জীবনের যে দিকগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে তা হ'ল দল সম্বন্ধে তাঁর মহান উপলব্ধি। একজন দারিদ্র্যপীড়িত দিনমজুর যাঁর নিজের জীবনে কোন আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না, তিনিই ছেলের মৃত্যুর পর বলেছিলেন, ছেলে মারা যাওয়ার দুঃখ তো আছেই, কিন্তু বেশি দুঃখ হল ছেলেকে আমি পার্টির হাতে তুলে দিতে পারলাম না; আমি গরিব মানুষ, পার্টিকে তো কিছুই দিতে পারি না, ছেলেটাকেই দিতাম। দলের উপলব্ধি কোন্ জায়গায় থাকলে একজন কমরেড এভাবে ভাবতে ও বলতে পারেন। শুধু শিক্ষিত হলে আর বক্তৃতা করতে পারলেই এভাবে বলা যায় না। তার জন্য মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত রুচি-সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, কমরেড কুইরী মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলেই হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভরসার জায়গা। এই এলাকার সকল মানুষ দলমত নির্বিশেষে নানা সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। বিষয়-আশয়, টাকা-পয়সার প্রত্যাশীও তিনি ছিলেন না। তবুও তাঁকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে আছে গভীর ষড়যন্ত্র। উপস্থিত জনসাধারণের কাছে কমরেড কুইরীর বিপ্লবী স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ও সেই চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনের আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সভার প্রধান বক্তা, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, কমরেড নারায়ণ কুইরীর সঙ্গে একসাথে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তবে তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ আমার ছিল না। আজ মালা দিতে গিয়ে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। মনে হচ্ছে তাঁর পায়ের কাছে বসে আমরা শিখতে পারি। তিনি বলেন, আমার বলাকে কেউ যেন 'বক্তৃতা' হিসাবে নেবেন না। আমি যা বলব তা আমার উপলব্ধি, বলতে পারেন স্বগতোক্তি। তিনি বলেন, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, যাঁকে আপনারা সকলে জানেন, যিনি এখানকার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন; তিনি বলেছেন, নারায়ণ কুইরীর মত কমরেড লাখে একজন হয়। কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, যারা আমার মত অন্ধ অথবা শারীরিকভাবে পঙ্গু, তারাও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে এসে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। কমরেড ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে, শোষক শ্রেণী তত বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কমরেডদের হত্যা করছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জায়গায় আমরা তা লক্ষ্য করছি।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য
ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩*
২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*
৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী*
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩
৪। *প্রকাশকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩
৫। *সম্পাদকের নাম ঃ*
মানিক মুখার্জী
জাতি ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩
৬। *সত্বাধিকারী ঃ*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী
১-৩-২০০৫ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার করিমপুর ২নং লোকাল কমিটির এলাকাভুক্ত ফাজিলনগর গ্রামের প্রবীণ এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড আজিত সেখ বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। এই এলাকায় প্রথমদিকে যাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনি এস ইউ সি আই দলের সংস্পর্শে আসেন ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও সিপিএম-কংগ্রেসের দাপট অগ্রাহ্য করে তিনি সর্বদাই গরিব মানুষদের দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর অসীম সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়, অন্য দলের কর্মীদেরও সমীহ আদায় করত।

নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দলের রাজনীতি বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধে হয়নি। এলাকার প্রতিটি পার্টি ক্লাস, গ্রুপ-রিডিংয়ে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন এবং যতক্ষণ না ভালভাবে বুঝতেন প্রশ্ন করে যেতেন। আঞ্চলিক আন্দোলন গড়ে তুলতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। ১৯৮৮ সালে কমরেড আজিত সেখ দলের আবেদনকারী সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি তা রক্ষার সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

কমরেড আজিত সেখ লাল সেলাম

কেন্দ্রীয় বাজেট

পাঁচের পাতার পর

অনেক বাড়বে। তার ওপর তেলের অগ্নিমূল্য সত্ত্বেও লিটার প্রতি বাড়তি ৫০ পয়সা সেস বসিয়ে কেন্দ্র বলে দিয়েছে, এটা তেলের দামের সঙ্গে যুক্ত হবে। অর্থাৎ মালিকদের নয়, এর বোঝা চাপবে জনগণের ঘাড়ে।

এই বাজেট পুরোপুরি জনবিরোধী

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মালিকদের জন্য বিপুল কর ছাড়, জনকল্যাণ খাতগুলিকে উপেক্ষা, এবং ঢালাও বেসরকারীকরণ — যা কংগ্রেসের নীতিকে অনুসরণ করেই বিজেপি করছিল, এবার বামপন্থীদের সমর্থনে ক্ষমতায় গিয়ে কংগ্রেস সরকারও তাই-ই করছে। বিলগ্নীকরণের বিষয়টি তারা বাজেটের বাইরে সারছে। বাজেটে তারা ধূর্ততার সাথে বিলগ্নীকরণের নামোচ্চারণ করেনি। এন ডি এ সরকার একজন বিলগ্নীকরণ মন্ত্রী বসিয়েছিল, যাকে মানুষ ব্যঙ্গ করে 'বেচারাম মন্ত্রী' বলতো। সেই বিলগ্নীকরণই ইউ পি এ করছে নিঃশব্দে। বাজেটে বিলগ্নীকরণের উল্লেখ না থাকাকে জোর গলায় নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার করেছিল সিপিএম। তারা লিখেছিল — ''বামপন্থীদের চাপের মুখেই শেষে এদিন বিলগ্নীকরণ থেকে বিরতই থাকতে হয়েছে সংস্কারের গুরু চিদাম্বরমকে'' (গণশক্তি ১-৩-০৫)। বাজেটের আগেই ইউপিএ সরকার টেলিকম শিল্পে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ মঞ্জুর করেছিল। বাজেটের পরপরই খনির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিদেশি পুঁজির কাছে খুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির আসার রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। বেগতিক দেখে সিপিএম দলের অর্থনীতিবিদ্ প্রভাত পট্টনায়ক বলেছেন — ''এই বাজেটে আনন্দ করার কোন কারণ নেই। নয়া উদারনৈতিক সংস্কারের রাস্তা থেকে সরে আসবার কোন লক্ষণ নেই। বরং খনি বা পেনশনে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতার বিনিময়ে শস্য বৈচিত্র্যকরণ, ... মূলধনী পণ্যে আমদানি শুল্ক হ্রাস, কর্পোরেট আয়করে উল্লেখযোগ্য ছাড়ের সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করছে নয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।'' তিনিই বলেছেন — ''দরিদ্রদের জন্য ন্যূনতম স্বস্তির বরাদ্দ আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে'' (গণশক্তি ৩.৩.০৫)। এই উপর উপর বিরোধিতাটাও আসলে তাদের চালাকি ; দু'দিকই খোলা রেখে জনগণ ও দলের কর্মীদের প্রতারণা করার কৌশল। এনডিএ সরকারের মতো এই সরকারের বাজেটও একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে তৈরি চূড়ান্ত জনবিরোধী বাজেট, যার পিছনে পূর্ণ সমর্থন আছে সিপিএমের।

সিপিএম নেতৃত্বের কংগ্রেস-ভজা দেউলিয়া রাজনীতি

বাজেটের আগে, গত ১ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য তিন দলের সঙ্গে সিপিএম নেতারা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাজেট সম্পর্কে ১১ দফা দাবি জানিয়ে এসেছিলেন (দ্রঃ গণশক্তি ২-২-০৫)। সেই দাবির ক'টি বা কতটুকু তাঁরা ''চাপ'' দিয়ে আদায় করেছেন, সেকথা বাজেটের পর তাঁরা তুলছেন না। তাঁদের মূল দাবি ছিল দুটি — প্রথমত, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে ৫০,০০০ কোটি টাকা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিডিপি করের অনুপাতকে ৯.২১ শতাংশ থেকে ১০.৭১ শতাংশ, অর্থাৎ দেড় শতাংশ বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে তাঁরা বলেছিলেন, তাঁরা শুধু দাবিই করেননি, দাবি পূরণের জন্য অর্থসংস্থানের পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। বাজেটের পর এসব দাবির কথা আর তাঁরা বলছেন না। কারণ ঐসব খাতে কংগ্রেস ৫০,০০০ কোটি টাকার অর্ধেক মাত্র ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তাও করেছে কাগজে-কলমে, বাস্তবে দেবে না। অন্যদিকে কর ও জিডিপি'র পারস্পরিক অনুপাত বাড়া তো দূরের কথা, আরও কমেছে। গত বছর মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ২৮,৩৮,১০০ কোটি টাকা, গত বছরের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। সেই হিসাবে আগামী বছর জিডিপি দাঁড়াবে ৩০,৩৩,৯২৮ কোটি টাকা। বাজেটে কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হল ২৭,৩৪৬৬ টাকা, অর্থাৎ পুরো কর আদায় হলেও তা হবে জিডিপি'র ৯.০১ শতাংশ, সিপিএমের প্রস্তাবিত ১০.৭১ শতাংশ থেকে অনেক কম, মোট হিসাবে ৫১,৫৭৬ কোটি টাকা কম। এ সম্পর্কেও সিপিএম নেতারা এখন চুপ। কারণ তাঁরাও এখন মালিকশ্রেণীকে কর ছাড় এবং গরিবের ওপর বোঝা চাপানো সহ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে এ রাজ্যে ঢালাও আমন্ত্রণ, বেসরকারীকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবসায়ীকরণ, শ্রমিক আন্দোলন দমন প্রভৃতির পক্ষে। কাজেই, এই জনবিরোধী বাজেটকে তারা পাশ হতেই সাহায্য করবে। কিছু ওজর-আপত্তি, যা তারা তুলছে তা নিতান্তই লোকদেখানো।

পরিশেষে তিনি সমবেত জনতার কাছে আবেদন জানান — কমরেড নারায়ণ কুইরীর মত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনারা নিন, নারায়ণ কুইরীর জীবন সংগ্রাম মানুষের কাছে পৌঁছে দিন, নারায়ণ কুইরীর মত মানুষ তৈরি করুন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

অনাহারে মৃত্যু, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

অফিসার ডাঃ আশীষ ঘোষের বিবৃতিতে। এই সৎ মানুষটি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, ''জাহেদা বিবির হাত-পা ফুলে গিয়েছিল। ...খাদ্যের অভাবেই এই অসুখ হয়। উনি দিন তিনেক আগে যখন হাসপাতালে এলেন তখন একেবারে শেষপর্যায় চলছিল। তাই বাঁচানো গেল না।''

জলঙ্গী, দয়ারামপুর, টলটলি, পরাশপুর প্রভৃতি এলাকায় সর্বস্ব খুইয়ে ভাঙন দুর্গতরা নিরাশ্রয়, রুজিহীন ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। সংখ্যাটি অন্তত এক হাজার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নামে যে তৎপরতার কথা প্রচার করে থাকে — তা যে কত শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা — জনজীবনের এই মর্মান্তিক ছবিগুলি সেই নির্মম সত্যকেই উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। মৃত আলিমুদ্দিনের পরিবারের এক সদস্য অভিযোগ করেছেন, ''এই এলাকায় ভিক্ষাও অমিল, কারণ ভিক্ষাটা দেবে কে?''

কার্যত এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছে। এমনকী রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ যারা করছে, তাদের খাদ্য ও মজুরি এখনও বকেয়া পড়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এইসব এলাকায় দুই থেকে সাতবার পর্যন্ত ভাঙনে বিধ্বস্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ ছিন্নমূল। সম্প্রতি বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে আছিয়া বেগম ও খাদিজা বানু ঐসব এলাকায় ঘরে ঘরে গিয়ে অজস্র অভিযোগ শুনেছেন, এবং তাঁদের অসহায়তা ও মর্মান্তিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। কান্দী মহকুমা গত বন্যায় যখন ভাসছে, মানুষ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অভাবে যখন রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে বসে আছে, তখন জলঙ্গীতে শুধু ভাঙনেই মাত্র ১০ দিনে ৩৫০ পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। পরিবার-পিছু বসবার একটা ত্রিপলও জোটেনি। কিছু পরিবার উঠেছিল প্রাথমিক স্কুলে। পরে তাদের বের করে দেওয়া হয়। তৎকালীন জেলাশাসককে জানানো সত্ত্বেও এই অবস্থার কোন প্রতিকার হয়নি। পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা সরকার করেনি।

''চর এলাকাতেও গরু নেওয়া যাচ্ছে না চাষের জন্য। গরুর বদলে মানুষই জোয়াল টানছে।'' মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যাভাঙন প্রতিরোধ কমিটি আহূত বিক্ষোভ মিছিলে জলঙ্গীর আছিয়া বেগম এই অভিযোগই তুললেন। সন্দেহ নেই যে, খুব গুরুতর এক পরিস্থিতিতে এই বিক্ষোভ আন্দোলন মনুষ্যত্বের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছে।

ভাঙন দুর্গতদের অনাহারে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের শাস্তি, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে পুনর্বাসন করা, তাদের জন্য স্পেশাল রিলিফ দেওয়া এবং শুখা মরশুমেই বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যারোধের পরিকল্পনার কাজ শুরু করা, ভাঙন বন্যা রোধে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের দাবিতে এবং আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যাভাঙন প্রতিরোধ কমিটি এক মিছিল ও ডেপুটেশনের কর্মসূচী নেয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের চরম অবহেলার পরিণতিতে অনাহারে মৃত্যুর বিরুদ্ধে একমাত্র সংগঠিত এই প্রতিবাদ মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন জলঙ্গীর ঐসব ভাঙন দুর্গতরা এবং খড়িবোনা, ধূলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ, রাণীনগর-২, মালিবাড়ি-১ এর চর এলাকার ও ভৈরবের ভাঙনে বিপর্যস্ত হুড়শীর দুর্গতরা। কান্দীর বন্যাপ্রবণ এলাকার বিপর্যস্ত মানুষও মিছিলে পা মেলায়। দুই শতাধিক মানুষের এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অতিরিক্ত জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি নিয়ে যান সভাপতি সহ প্রবীণ শিক্ষক নেতা কমলকান্তি ঘোষ, খাদিজা বানু, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুস সঈদ ও জলঙ্গীর ভাঙ্গন-দুর্গত চাহাতন বিবি সহ অন্যান্য দুর্গত মায়েরা। স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনার সময় এই মা-বোনেরা বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে ডি এম অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায়। তিনি ভাঙন সমস্যাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার ও মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সহসভাপতি প্রধান শিক্ষক অনিল কুমার দাঁ, বর্ষীয়ান নন্দদুলাল সরকার, খাদিজা বানু, সাজেম আলি, গৌতম সাহা প্রমুখ। বন্যাভাঙন দুর্গতদের সরকারি হৃদয়হীনতা নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নবগ্রামের সৌমেন দাস। অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাঙন এলাকায় প্রতি পরিবারের লোক যাতে কাজ পায় তা দেখার এবং বি এস এফের অন্যায়-অত্যাচারের সুরাহা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া উদ্বাস্তরা যেখানে আছে সেখানেই জমি কিনে দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়ার সুপারিশ করবেন বলেও জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভাঙনরোধে যে অর্থবরাদ্দের কথা বিবৃতি হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে — সে সম্পর্কে প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে জেলা শাসক জানান — অর্থ বরাদ্দের কোন সরকারি নির্দেশ তাঁর জানা নেই।

কর্ণাটকে ছাত্র আন্দোলনের জয়

কর্ণাটকে গুলবর্গা বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ এবছর ডিগ্রি কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কনভোকেশন সার্টিফিকেটের জন্য ৪৮০ টাকা করে দিতে হবে বলে ফতোয়া জারি করে দেয়। ইতিপূর্বে এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাটা ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিলনা। যাঁরা তা নিতে চাইতেন, তাঁদের দেওয়া হত, কিন্তু সেজন্য কোনও দাম কর্তৃপক্ষ নিত না। এবার দুটোই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ডিগ্রি কোর্সের সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১২.৫ শতাংশ ফি বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়। এই ঘোষণায় স্বভাবতই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। গুলবর্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ১৯ জানুয়ারি মিছিল করে কর্তৃপক্ষের কাছে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু সময় চান। ডি এস ও'র পক্ষ থেকে পাঁচ দিন সময় দেওয়া হয়। পাশাপাশি ডি এস ও'র জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাইচুর, বেলারি, বিদার প্রভৃতি জেলার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান-এর কর্মসূচি নেওয়া হয়। উপাচার্য ছাত্রপ্রতিনিধিদের সাথে ২২ জানুয়ারি আলোচনা করবেন বলে জানান। ইতিমধ্যে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে উপাচার্য ছাত্র প্রতিনিধিদের জানান যে, ফি বৃদ্ধির ও সার্টিফিকেটের দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং এবিষয়ে সমীক্ষা করার জন্য সিণ্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক জে এস পাটিলের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করা হবে। আন্দোলনের এই বিজয় ছাত্রদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়েছে। ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য ডি এস ও 'ডিগ্রি কোর্স স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি' গঠন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের সভায় বক্তব্য রাখছেন এ আই ডি এস ও'র গুলবর্গা জেলা সভাপতি কমরেড গাউস প্যাটেল

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ৮২তম শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন সংগ্রামী ধারার বলিষ্ঠ সৈনিক শহীদ গোপীনাথ সাহার ৮২তম শহীদ দিবসে, ১ মার্চ হুগলি জেলার ছাত্র-যুবক, শিক্ষক সহ সর্বস্তরের মানুষ এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৮টায় শ্রীরামপুর স্টেশনে শহীদ গোপীনাথ সাহার আবক্ষ মূর্তির পাদদেশ থেকে প্রভাতফেরী শুরু হয়; শহর পরিক্রমা করে আবার স্টেশন চত্বরে ফিরে আসে। সেখানে সভা হয়। আজকের দিনে শহীদ গোপীনাথ সাহার বিপ্লবী জীবনচর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা করেন নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক সান্টু গুপ্ত।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষে সুহাস মুখোপাধ্যায় শহীদ গোপীনাথ সাহার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতি আশালতা সরকার তৎকালীন যুগের যুবক-যুবতীদের লড়বার যে তেজ ছিল তা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে বিপ্লবীদের উদ্ধৃতি সম্বলিত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীরামপুরের বহু মানুষ এবং এ আই ডি এস ও'র কর্মী-সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

বীরভূম

দুবরাজপুর বিডিও সমীপে শ্রমিক-কর্মচারীরা

জেলায় শ্রমিক-কর্মচারী, বিশেষত বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থা খুব সঙ্গিন। মজুরি মেলে যৎসামান্য, যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম। নেই কাজের স্থায়িত্ব ও পি এফের সুযোগ। কমিউনিটি হেলথ্ গাইড ও প্রশিক্ষিত ধাইদের অসহায় অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। এই সমস্ত দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউ টি ইউ সি-এল এস এবং বি এস এস-এর যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'দুবরাজপুর শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম কমিটি'। উল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধান সহ সরকারি হাসপাতালে 'পিপিপি' চালু না করা, সরকারি হাসপাতালে গরিব মানুষের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, বাসের ভাড়া পুনরায় বৃদ্ধি না করা প্রভৃতি দাবিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবরাজপুর ব্লকে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড নিস্তারুল ইসলাম এবং কমরেড গঙ্গাধর হাজরা'র নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে ১০ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বিডিও'র কাছে প্রদান করে।

মুর্শিদাবাদ

সালার থানা বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির আহ্বানে গত ২২ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের হাটতলায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন চৌধুরী নুরুল কাদের। কনভেনশনে বক্তাগণ বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির চাপ এবং পর্ষদ কর্মচারীদের দ্বারা নানাপ্রকার হয়রানির অভিযোগ তুলে ধরেন। কনভেনশনে সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কুনাল বিশ্বাস বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরে বলেন, ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি, মিটার ভাড়া, ফিক্সড চার্জ, সরকারি ডিউটি কিছুটা কমেছে। তিনি আরও বলেন, পর্ষদ বিদ্যুৎ আইন ২০০৩কে হাতিয়ার করে মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৩৭৩ কোটি টাকা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে, এবং গত এপ্রিল ২০০০ থেকে বাড়তি চার্জ বকেয়া হিসাবে আদায় করবে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে তিনি আহ্বান জানান। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ, লো-ভোল্টেজ, লোডশেডিং বন্ধ ও অগণতান্ত্রিক বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ বাতিলের দাবিতে আগামী ২২ মার্চ দিল্লীতে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচিকে সফল করার আহ্বান জানান। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে চৌধুরী নুরুল কাদেরকে সভাপতি এবং গোলাম সিদ্দিকি (জাহাঙ্গীর)কে সম্পাদক করে ১৭ জনের সালার থানা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in